আবহমান ভারত

রঞ্জিত সেন

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

"গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার কারণ কী? তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যেদের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযতও করিতে হয়।... প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।"

(রবীন্দ্রনাথ)

"সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে, সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু, সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন। সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই, সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই। কতগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে।"

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? মূর্খ, অনুকরণদ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করিলে কোন বস্তুই আপনার হয় না।"

(স্বামী বিবেকানন্দ)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষ

১। উত্তরে হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে আবদ্ধ যে-দেশ তাকে বলে ভারতবর্ষ। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্ভারতং নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

২। "যে দেশ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে তার নাম ভারত। সেখানে ভরতের সন্তানরা বাস করে।"

কে এই ভরত? বিষ্ণুপুরাণে ভরতকে মনুর বংশধর বলা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে পরাশরের মত হল এই।—

পৃথিবীর প্রথম পুরুষ হলেন মনু (কোরাণ ও বাইবেলে আদম)। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু। তাঁর ছিল দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রত বিবাহ করেছিলেন কর্দমরাজদুহিতা কাম্যা বা কন্যাকে। কালক্রমে কাম্যা দুই কন্যা ও দশ পুত্রের জন্ম দিলেন। কন্যারা হলেন স্মৃতি ও কুক্ষি; পুত্ররা হলেন অগ্নিধর, অগ্নিবাহু, বপুষ্মৎ (বা বপুমান), দ্যুতিমৎ (বা দ্যুতিমান), মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবল, পুত্র, জ্যোতিষ্মৎ (বা জ্যোতিষ্মান)। পুত্রদের মধ্যে তিনজন মেধা, পুত্র ও অগ্নিবাহু ধর্মজীবনকে আশ্রয় করলেন। তখন প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে বিভক্ত করে তাঁর অবশিষ্ট পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অগ্নিধর পেলেন জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপ, বপুস্মৎ শাল্মলীদ্বীপ, জ্যোতিষ্মৎ কুশদ্বীপ, দ্যুতিমৎ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, ভব্য শকদ্বীপ, সবল পুষ্করদ্বীপ।

৩। অগ্নিধরের পৌত্র হলেন ভরত। অগ্নিধর তার নয়পুত্রের মধ্যে জম্বুদ্বীপকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এর প্রথম ভাগটির নাম হল 'হিম্'। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই হিমের অংশই হল ভারতবর্ষ, যেখানে ভরতের সন্তানসন্ততিরা বাস করে।

৪। জম্বুদ্বীপকে পুরাণ-রচয়িতারা সাতটি দ্বীপের প্রধান দ্বীপ এবং প্রায় কেন্দ্রীয়-দ্বীপরূপে চিন্তা করেছেন। রামায়ণ-এর ধারণা অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের উত্তরে ব্রহ্মলোক, দক্ষিণে পিতৃলোক, পূর্বে দেবলোক এবং পশ্চিমে বরুণলোক। জম্বুদ্বীপ থেকে ব্রহ্মলোকের দিকে পরপর ছয়টি পর্বত কল্পনা করা হয়েছে। সেগুলি হল হিমালয়, সুদর্শন, কৈলাস, ক্রৌঞ্চ, মৈনাক আর সোমগিরি। সুদর্শন ও ক্রৌঞ্চের মাঝে আছে একটি বিস্তীর্ণ জলহীন অঞ্চল। মৈনাক আর সোমগিরির মাঝে আছে উত্তরকুরু। পুরাণে উত্তরকুরুকে জম্বুদ্বীপের উত্তরতম অঞ্চলরূপে কল্পনা করা হয়েছে। জম্বুদ্বীপ থেকে পিতৃলোকের দিকে পরপর ছয়টি পাহাড় আছে : পুষ্পিতক, সূর্যনভ, বৈদ্যুত, কুঞ্জর, ভগবতী ও ঋষভগিরি। শেষেরটিই হল বাসুকির আলয়। জম্বুদ্বীপের পশ্চিমতম প্রান্তে আছে একটি পাহাড়, অস্তাচল। পূর্বদিকে আছে উদয়গিরি। তার আগে আছে কূটশাল্মলী যেখানে বৈনতেয়র বাস। জম্বুদ্বীপের পূর্বে কয়েকটি সমুদ্রের কথাও রামায়ণে আছে। এগুলি হল লবণ, রক্ত, দুধ ও বিশুদ্ধ জলের সমুদ্র। পণ্ডিতরা মনে করেন লবণসমুদ্রই হল বঙ্গোপসাগর। অতএব অন্যান্য সমুদ্রগুলোও ভারতবর্ষের পূর্বদিকেই অবস্থিত। রামায়ণ-এর মানচিত্রে মেরুপর্বতকে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে জম্বুদ্বীপের পশ্চিমে দেখানো হয়েছে। মহাভারতেও মেরুপর্বতকে জম্বুদ্বীপের পশ্চিমে কল্পনা করা হয়েছে, তবে তফাত হল এই যে রামায়ণে জম্বুদ্বীপ ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রে আর মহাভারতে পৃথিবীর কেন্দ্রে বসানো হয়েছে মেরুপর্বতকে। মহাভারতের মানচিত্রেও উত্তরকুরু রয়েছে জম্বুদ্বীপের উত্তরে, আর মেরু ও জম্বুদ্বীপ উভয়ের দক্ষিণে আছে হরিবর্ষ, হেমকূট বা কৈলাস ও হিমবৎবর্ষ যাদের নীচে আছে যথাক্রমে হিমালয় ও ভারতবর্ষ। মেরুর উত্তরতম প্রান্তে হচ্ছে দুধসাগর আর দক্ষিণতম প্রান্তে, ঠিক ভারতবর্ষের নীচেই হচ্ছে লবণসাগর। পুরাণে 'হিম' বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে তা কি তাহলে মহাভারতে বর্ণিত হেমকূট, হিমবৎবর্ষ ও হিমালয় অঞ্চল? যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে যে রামায়ণ-এর কাল থেকে মহাভারতের সময় হয়ে পুরাণের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ এই অভিধাটির একটি বিবর্তন ঘটছিল। রামায়ণে জম্বুদ্বীপের প্রাধান্য মহাভারতে অপসৃত হল আর পুরাণের দৃষ্টিকোণ জম্বুদ্বীপকে ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল সমুদ্র ও হিমালয়ের মাঝখানে ভারতবর্ষের উপর। কোন কিছু ঝাপসা না রেখেই পুরাণ সমস্ত পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের মধ্যে ভাগ করে ফেলল। এই সাতটি দ্বীপ হল জম্বুদ্বীপ (উত্তর থেকে দক্ষিণে এশিয়ার মূল ভূভাগ), পুষ্করদ্বীপ (এশিয়ার পূর্বাঞ্চল), শকদ্বীপ (এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল), ক্রৌঞ্চদ্বীপ (ইউরোপের মূলভূখণ্ড), প্লক্ষদ্বীপ (ইউরোপের দক্ষিণ ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল), কুশদ্বীপ (পশ্চিম এশিয়ার আরবাঞ্চল) ও শাল্মলীদ্বীপ (আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল)। যাইহোক, মোটকথা হল একটি। পুরাণের যুগেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণাটি

যাবতীয় অস্পষ্টতা ও রূপকের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে ভৌগোলিক অর্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরাণ কিন্তু কখনই বলেনি যে পৃথিবীর স্থলভাগ জলভাগকে বেষ্টন করে আছে। বরং পুরাণের ধারণাই হল যে সাতটি সমুদ্র সাতটি দ্বীপকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও তাদের ঘিরে আছে।

৫। মনে রাখা দরকার যে, জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে পুরাণে যে ধারণা, অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ হল উত্তর থেকে দক্ষিণে এশিয়ার মধ্যাঞ্চল, তা পারসিকদের ধারণার সঙ্গে কিছুটা মিলে যায়। সনাতন আর্যরা পৃথিবীর যে-অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল বলে মনে করতেন তাকে নাম দিয়েছিলেন জম্বুদ্বীপ। পারসিকরা সেই অঞ্চলটিকে বলতেন Khonneretz-Bami—যার অন্তর্গত ছিল পূর্বে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার প্রসারিত মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। জেন্দ-আবেস্তা পৃথিবীকে সাতটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত করেছে। সেগুলি হল তাজি (আরব), ইরান (পারস্য), মাজেন্দ্রান (পূর্ব-ইউরোপের স্লাভ অঞ্চল), তুরান (তুরস্ক), রুম (রোমান সাম্রাজ্য), সিন্দ (ভারতবর্ষ) এবং চিনিস্তান (চীন)। চীনের প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবী পাঁচটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই পাঁচটির মধ্যে প্রধান সাম্রাজ্যটি হল ইরাক, কারণ ইরাক খুব সমৃদ্ধ ও পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। তার রাজাকে বলা হত 'রাজরাজেশ্বর' (King of Kings)। তার পরের সাম্রাজ্যটি হল চীন সাম্রাজ্য। তার রাজাকে বলা হত 'প্রজাধিরাজ' (King of Peoples), কারণ তিনিই পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রজাদের সবচেয়ে বেশি মঙ্গলসাধন করতেন। তৃতীয় সাম্রাজ্যটি হল তুরস্ক যার রাজাকে বলা হত 'ভয়ঙ্কর শ্বাপদরাজ' (King of Ferocious Beasts)। চতুর্থ রাজ্যটিকে বলা হত 'হস্তীরাজার' দেশ (Land of the King of Elephants), আর তা হল ভারতবর্ষ। হস্তীরাজকে 'প্রজ্ঞাধিরাজ'ও বলা হত কারণ প্রজ্ঞা ভারতবাসীর সহজাত। সর্বশেষ সাম্রাজ্যের রাজাকে বলা হত 'রোমানদের সম্রাট' (Emperor of the Romans) অথবা 'সুশ্রী মানুষের রাজা' (King of Beautiful People)। প্রাচীন চৈনিক ও পারসিকরা পৃথিবীকে যেভাবে ভাগ করেছিলেন তার সঙ্গে পুরাণের ভাগগুলি কিছু কিছু মেলে। চীনারা সিং-লিং (Tsing-Ling) পর্বতমালাকে মধ্যবিন্দু ধরে তার পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই সাম্রাজ্যগুলির অবস্থান নির্ণয় করেছেন। সিং-লিং হল পামীর পর্বতগ্রন্থি, অর্থাৎ পুরাণের কথিত মেরু। এইটিই আবার পারসিকদের Khonneretz-Bami-র প্রায় কেন্দ্রস্থান। উল্লেখযোগ্য, প্রাচীন পারসিকরা, চীনারা ও মহাভারত ও পুরাণের যুগে ভারতীয় আর্যরা ভারতবর্ষকে পামীর গ্রন্থির দক্ষিণে স্থাপন করেছেন। মহাভারতের চেতনায় ভারতবর্ষ অনেক বড়। সেখানে বলা হয়েছে যে যুধিষ্ঠির জম্বুদ্বীপের রাজা ছিলেন। সেই তুলনায় পুরাণের ভারতবর্ষ অনেক ছোট। এর থেকে বোঝা যায় যে যত দিন যাচ্ছিল ততই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হচ্ছিল। একেবারে আদিযুগে, অর্থাৎ বেদের যুগের প্রথমদিকে পৃথিবীকে চারটি দ্বীপে বিভক্ত করা হয়েছিল—জম্বু, উত্তরকুরু,

কেতুমালা ও ভদ্রাশ্ব। মেরু বা মহামেরু, যা পরবর্তী যুগে পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় প্রাধান্য পেয়েছিল, ঋগ্‌বেদে তার কোন উল্লেখ নেই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যুগেই তার প্রথম উল্লেখ আমরা পাই। ক্রৌঞ্চ ও মৈনাক পাহাড় ও এই সময় থেকে উল্লিখিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে ঋগ্‌বেদে উত্তরকুরুর কোন বর্ণনা নেই। অথচ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করে বলা আছে যে হিমবন্তের ওপারে রয়েছে উত্তরকুরু। এইভাবে বেদের যুগ থেকে ভারতীয় আর্যদের ভৌগোলিক জ্ঞান ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল, আর তা পরিণতি লাভ করে পুরাণের যুগে। অথচ পুরাণের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে বনিয়াদ তা লুকিয়ে আছে বেদের যুগ থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে। মোটামুটিভাবে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক চিন্তার কাঠামোটি দিয়েছিল বেদ। তার উপরেই অস্থিমজ্জা বসিয়েছিল রামায়ণ-মহাভারত ও যাবতীয় পুরাণ। উদাহরণস্বরূপ সমস্ত পৃথিবীকে কয়েকটি দ্বীপে বিভক্ত করার ধারণাটি এসেছিল বৈদিক সাহিত্য থেকে। আর এই ধারণার মধ্যে নিহিত ছিল প্রাচীন আর্যদের ভৌগোলিক জ্ঞানের উৎকর্ষ যা সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। পৃথিবীর স্থলভাগ জলভাগের দ্বারা বেষ্টিত, এই ঘটনাটিই সত্য, এর বিপরীতটি নয়, একথা জানতে পেরেছিল বলে আর্যদের মধ্যে দ্বীপের চেতনা এসেছিল। এই চেতনা ছিল বলেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান বুঝতে পারা তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি।

৬। এতদ্‌সত্ত্বেও বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত হয়ে পুরাণের কাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোথাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না যাকে ভারতবর্ষের একটি প্রকৃষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা বলা যেতে পারে। বিদেশী লেখকরাও সেরকম কোন সংজ্ঞা দিতে পারেননি। 'সপ্তসৈন্ধব' বলতে বৈদিক আর্যরা মনে হয় পাঞ্জাব অঞ্চলকেই বোঝাতেন। ভারতবর্ষের যেটুকু অংশে আর্যদের বসতি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল, সেই অংশটুকুকেই বৌধায়ন ও মনুর যুগে 'আর্যাবর্ত' বলা হত। সিন্ধু উপত্যকা, বা খুব বেশি হলে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিকেই গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস[১] 'ইন্দ' (Ind) অথবা 'ইন্দু' (Indu) বলে বর্ণনা করেছেন।[২] খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কাত্যায়ন ও মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) রচনায় আমরা সর্বপ্রথম দক্ষিণে পার্বত্য

১. 'ইতিহাসের জনক' হেরোডোটাস ৪৯০ থেকে ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত কেরিয়ার অভ্যন্তরে হেলিকারনেসাস (Halicarnassus) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The History* (or *The Histories*) থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

২. হেরোডোটাস বলেছেন যে হিসটাসপেসের (Hystaspes) পুত্র ডেরিয়াস (Darius) বা দরায়ুস কুড়িটি স্যাট্রাপি (Satrapy) বা প্রাদেশিক শাসন বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে সর্বশেষেরটি হল ভারতবর্ষ।

অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষের বর্ণনা পাই। রামায়ণ ও মহাভারতেও এই বর্ণনা আছে। আরও পরে যখন ভারতীয় রাজারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন তখন ভারতবর্ষের সংজ্ঞার মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বে সুমাত্রা ও জাভা প্রভৃতি দ্বীপকে গ্রহণ করা হত। কানিংহাম এই সংজ্ঞাকে বৃহত্তর ভারতের (Greater India) সংজ্ঞা বলে বর্ণনা করেছেন। একথা হয়তো ঠিক, কারণ মৌর্য যুগে প্রকৃত ভারতবর্ষের বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভারতীয় রাজাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এই বৃহত্তর ভারতকে জম্বুদ্বীপ বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতবর্ষকে নয়টি 'ভেদ' বা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম আটটির নাম হল : ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান[৩], তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান[৪], নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব ও বরুণ[৫]। নবমটির উল্লেখ নেই। তার

"The Indians, the most populous of all the nations in the words, paid the largest sum—360 talents of gold-dust." "That part of India towards the rising sun is all sand. Indeed of all the inhabitants of Asia of whom we have any reliable information, the Indians are the most easterly—beyond them the country is uninhabitable desert." "There are many tribes of Indians who speak different languages; some of them are pastoral and nomadic, and others are not. Some inhabit the marsh-country by the river"—*The Classical Accounts of India* by Dr. R. C. Majumdar. Calcutta, 1960, P. 1. উপরের এই সমস্ত বর্ণনা থেকে মনে হয় যে হেরোডোটাস 'Ind' বলতে সিন্ধু-উপত্যকাকেই বুঝিয়েছেন। ডেরিয়াস সিন্ধুনদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য জলপথে একদল অভিযাত্রী পাঠিয়েছিলেন। এই দলে ছিলেন স্কাইলাকস্ (Scylax)। এই দলটি কাসপাটাইরাস (Caspatyrus) শহর থেকে যাত্রা করে প্যাকটাইস (Pactyice) অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল। ডঃ এম্. এ. স্টেন (Dr. M.A. Stein : *Memoir on Maps illustrating the Ancient Geography of Kashmir.* 1899) প্যাকটাইক (Paktyike) নামে একটি অঞ্চলের স্থান নির্ণয় করেছেন কিন্তু প্যাকটাইস এখনও অনির্ণীত রয়েছে। প্যাকটাইক হল প্রাচীন গান্ধার ও বর্তমান পেশোওয়ার অঞ্চল। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্যাকটাইসকে এখনকার পাখতুন (Pakhtun) বা পাঠানদের অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছেন। স্টেন বিশ্বাস করেন যে স্কাইলাকসের অভিযান শুরু হয়েছিল জাহাঙ্গীরা (Jahangira) নামক স্থান থেকে। এই স্থানটি ছিল কাবুল ও সিন্ধু, এই দুই নদের সঙ্গমস্থল থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে হেরোডোটাস সিন্ধু উপত্যকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখতেন। স্কাইলাকস্ কেরিয়ার অন্তর্গত কারিয়াণ্ডার (Caryanda) অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানটি হেরোডোটাসের নিজের স্থান হেলিকারনেসাসের কাছেই ছিল। মনে হয় তিনি স্কাইলাকসের অভিযান সম্বন্ধে ভুল কথা বলেননি।

৩. কশে[সে]রু—মেরুদণ্ড।

৪. গভস্তি—কিরণ, সূর্য; গভস্তিমৎ[মান]—সূর্য।

৫. বরুণ—পশ্চিমদিকের অধিপতি, জল, জলেশ, সূর্য।

বদলে বলা হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে সহস্র যোজনব্যাপী এই খণ্ডের পূর্বে থাকে কিরাতরা ও পশ্চিমে যবনরা (Ionians), আর এই দুই জাতির মধ্যে থাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা। এই খণ্ডটিকে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বেশিরভাগ পুরাণে এই খণ্ডটির নাম পাওয়া যায় না। বামন পুরাণে এই খণ্ডের নাম কুমার, স্কন্দপুরাণে কুমারিকা। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় দশবিভাগের যে উল্লেখ আছে তাতে নবম খণ্ডকে দ্বীপ বলা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে কুমারী। মার্কণ্ডেয় সমেত সমস্ত পুরাণগুলির মত হল যে এই খণ্ডগুলি পরস্পর সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং একটির থেকে অন্যটি অগম্য। বামন ও গরুড়পুরাণে সৌম্য.ও গন্ধর্ব খণ্ড দুটির অন্য নাম দেওয়া হয়েছে কটাহ ও সিংহল।

৭। পুরাণ ছাড়া আরও অন্যান্য গ্রন্থে এই খণ্ডগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ভাস্করাচর্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'। কিন্তু কোথাও এই খণ্ডগুলির সঠিক বর্ণনা নেই। ফলে দীর্ঘকাল ধরে এদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা চলছে। পুরাণগুলিতে ভারতবর্ষের আকৃতি নিয়েও বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্ধচন্দ্র, ত্রিকোণ, বিষম চতুর্ভুজ, টেনে ধরা ধনুকের জ্যা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা পুরাণের খুব প্রিয় বিষয় এবং ভারতবর্ষকে এর প্রত্যেকটি রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। জলবেষ্টিত দক্ষিণভারতকে পুরাণ-রচয়িতারা কখনই অস্বীকার করেননি যেমনটি করেছিলেন কোন কোন বিদেশী লেখক, যেমন টলেমি[৬] (Ptolemy)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতবর্ষকে কূর্মের আকার দেওয়া হয়েছে। এই কূর্মাকৃতি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কাবুল উপত্যকা, সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল, পশ্চিমের সমুদ্র-উপকূল, গোদাবরীর উপত্যকা, কলিঙ্গ অঞ্চল ও মধ্য-দক্ষিণ ভারতের মালভূমির বেশ কিছুটা। টলেমি গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে মাকরাণ পর্যন্ত একটি সরলরেখা টেনে ভারতের সমুদ্র-উপকূল ও তার সীমানা নির্দেশ করেছিলেন। পুরাণ এ-ধরনের সরল ব্যাখ্যার মধ্যে কখনও প্রবেশ করেনি। দক্ষিণকে পুরোপুরি না জানলেও অন্তত তাকে অনুমান করার উৎসাহ পুরাণের ছিল, যদিও তার মূল ঝোঁক ছিল উত্তর-ভারত ও তার সংলগ্ন এশিয়ার মধ্যাঞ্চল এবং সেখানকার নদী ও পাহাড়ের উপর। প্রায় সমস্ত পুরাণে

৬. টলেমির আসল নাম ছিল ক্যালোডিয়াস টলেমিয়াস (Calaudius Ptolemaeus)। তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এন্টোনিয়াস পায়াসের (Antonius Pius) রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়াতে বাস করতেন। গণিত, সংগীত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলে তার দুটি অসাধারণ গ্রন্থ হল *Almagest* ও *An Outline of Geography* (মতান্তরে *Treatise on Geography*)। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমটির সম্পূরক। তিনি জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূগোল রচনা করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখেছেন। কিন্তু তার প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্য ত্রুটিপূর্ণ।

হিমালয়কে অবতলিক (Concave) দেখানো হয়েছে। এই অবতলিক পর্বতমালার দক্ষিণের অংশ যে ভারতবর্ষ এই জ্ঞান পুরাণের যুগে একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়।

৮। উপরের সিদ্ধান্তকে সত্য ধরলে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন থাকে : মার্কণ্ডেয় পুরাণ যে ভারতবর্ষকে নয়টি 'খণ্ডে' বিভক্ত করেছে তা কি এই হিমালয়ের দক্ষিণের ভারতবর্ষ? বোধহয় না। পণ্ডিতেরা প্রকৃত ভারতবর্ষের বাইরে কোন কোন অঞ্চলকে পুরাণবর্ণিত কোন কোন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অলবেরুণীর মতে ইন্দ্রদ্বীপ হল মধ্যদেশ। আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরীতে এই খণ্ডকে সিংহল ও মহেন্দ্রগিরির (পূর্বঘাট পাহাড়) মাঝখানের কোন অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছেন। সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন ইন্দ্রদ্বীপ হল ব্রহ্মদেশ অথবা ব্রহ্মপুত্রের ওপারের অঞ্চল যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গরুড় পুরাণে স্পষ্ট করে বলা আছে যে ইন্দ্রদ্বীপ মহেন্দ্রগিরির পরপারে অবস্থিত। অথচ পরপারের অঞ্চলকে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলকে কেউ কেউ কসেরুমান বলে অনুমান করেছেন। মধ্যদেশের পূর্বাঞ্চল ও মহেন্দ্রগিরির পশ্চিমে ও সুক্তি পর্বতের (মৎস্য পুরাণের সুক্তিমান পর্বত) পূর্বের অঞ্চলকে কসেরুমান বলে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে অলবেরুণী ও আবুল ফজল। কারও কারও মতে কসেরুমান হল মালয় অঞ্চল। তাম্রবর্ণকে তাম্রপর্ণ বা তাম্রপর্ণী বলে পাঠ করা হয়েছে। অলবেরুণীর মতে তার অবস্থান দক্ষিণ-পূর্বে। তা মালয় থেকে সুক্তি পাহাড়ের মধ্যে কোন অঞ্চল—এটি আবুল ফজলের মতো। সুক্তির অবস্থান যে বিন্ধ্য পাহাড়ের দক্ষিণে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ-ভারতের তাম্রপর্ণী নদীর জলবিধৌত অঞ্চলকে কেউ কেউ তাম্রবর্ণ বলেছেন। গ্রিক ভূগোলবিদরা সিংহলকে তপ্রবেন (Taprobane) বলেছেন। অশোকের শিলালিপিতেও সিংহলকে তাম্বপন্নি বলা হয়েছে। সুদূর দক্ষিণকে প্রাচীন সাহিত্যের অনেকস্থানে 'তামিলকম্' বলা হয়েছে। এর থেকে অনেকে অনুমান করেন যে তাম্রবর্ণ হয় সিংহল না হয় দক্ষিণ-ভারতের কোন অঞ্চল। অলবেরুণীর মতে গভস্তিমান হল মধ্যদেশের দক্ষিণাঞ্চল। আবুল ফজল বলেছেন যে মালয় থেকে রক্ষ পাহাড়ের (বিষ্ণুপুরাণের রিক্ষ পাহাড়, বর্তমানের বিন্ধ্য) মধ্যের কোন অঞ্চল হল গভস্তিমান। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে নাগদ্বীপ সিংহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সৌম্যের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। মধ্যদেশের উত্তর-পশ্চিমকে অলবেরুণী গন্ধর্ব বলেছেন। হয়তো বা এই নামের অপভ্রংশ পরবর্তী-কালের গান্ধার। গরুড় পুরাণে গন্ধর্বকে সিংহল বলা হয়েছে। বরুণখণ্ডকে আবুল ফজল বিন্ধ্য পর্বত ও সহ্যাদ্রির (পশ্চিমঘাট পাহাড়) মাঝখানের অঞ্চল বলেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরাণ বর্ণিত নয়টি খণ্ডের সবকটিই ভারতবর্ষের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পড়ছে না। কানিংহাম এই নয়টি খণ্ডকে বৃহত্তর ভারতবর্ষ বলেছেন। ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, সিংহল ইত্যাদিকে তিনি বৃহত্তর ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করেন।

৯। বিষ্ণুপুরাণে হিমালয় ও সমুদ্রের মাঝে আবদ্ধ যে ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে তা এই বৃহত্তর ভারতের অংশমাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পুরাণ রচয়িতাদের দুটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা ছিল, একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষ, আরেকটি ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপের ধারণাটি এই বৃহত্তর ভারতবর্ষের ধারণা। ভরত জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, যুধিষ্ঠির জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করেছেন এবং জম্বুদ্বীপের উপর মৌর্যদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যের এই সমস্ত উক্তি থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে বৃহত্তর ভারতের কোন কোন অংশের উপর ভারতীয় নৃপতিদের প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিকল্পে এও বলা যায় যে আর্যরা যে সমস্ত অঞ্চ ল থেকে এসেছিলেন, অথবা যে সমস্ত অঞ্চ ল অনেক আগেই তাদের জ্ঞানের বৃত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল তাকে তাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন [যেমন টলেমি চেয়েছিলেন] তাঁর সমস্ত পূর্বসূরিগণের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমন্বিত করে এবং পরিমার্জনা করে তার ভূগোল রচনা করতে। এই দুটি দৃষ্টিকোণই আপাতত গ্রাহ্য বলে মনে হয়। টলেমি যখন বিন্ধ্য পাহাড় থেকে মাকরাণ পর্যন্ত সরলরেখা টেনে ভারতের ভৌগোলিক উপকূল রেখাকে দেখাতে চান তখন তিনি হয়তো ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষের সীমারেখার সঠিক নির্ধারণ করেননি, কিন্তু বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর্যদের সনাতন জ্ঞানের কিছু স্বীকৃতি তিনি দিয়েছিলেন, কারণ বৃহত্তর ভারতবর্ষের যে অংশ জম্বুদ্বীপ তার দক্ষিণ সীমান্তরেখা কিছুটা টলেমি অঙ্কিত সরলরেখার সঙ্গে মিলে যায়। আর্যদের প্রথম প্রভাব এই অঞ্চ লের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা যখন আরও দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে সরে আসতে থাকেন তখন বৃহত্তর ভারতের কোন কোন অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ, আমাদের বর্তমান চেতনার প্রকৃত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে পড়েন। অথচ বৃহত্তর ভারতবর্ষকে ভোলাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর দুই ভারতের সমন্বয় করা দরকার, আর তা করল বায়ুপুরাণ। এই পুরাণের মতে ভারতবর্ষের অবস্থান সমুদ্রের উত্তরে ও হিমবানের দক্ষিণে। এটি নিশ্চয় ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের বিস্তার উত্তর থেকে দক্ষিণে, কুমারিকা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ৯,০০০ যোজন। এই [৯,০০০] যোজন তো জম্বুদ্বীপের ব্যাপ্তি। এই ৯,০০০ যোজনের মধ্যে আছে নয়টি খণ্ড, যার শেষেরটির ব্যাপ্তি ১,০০০ যোজন। এই শেষেরটির মধ্যেই থাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাহলে কি এই শেষের খণ্ডটিই ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ? বোধহয় তাই।

১০। কোন কোন পুরাণে যখন ভারতবর্ষের নয়টি খণ্ড নিয়ে মাতামাতি চলছে তখন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিভাগগুলিকে কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাও পাশাপাশি শুরু হয়েছিল। অথর্ববেদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতবর্ষের পাঁচটি খণ্ডের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিরচয়িতা বৌধায়ন বেদের এই ধারাকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে

বিভক্ত করেছেন। বৌধায়নের ধারাকে গ্রহণ করেছেন রাজশেখর, তাঁর কাব্যমীমাংসায়। বৌদ্ধ লেখকরা, বিশেষ করে হিউয়েন-সাং ভারতবর্ষের পাঁচটি ভাগের কথা বলেছেন। মহাভারতও ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছে যার প্রধানটি হল মধ্যদেশ। মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণেরও এই মত। বায়ুপুরাণে নয়টি খণ্ডের উল্লেখ থাকলেও ভারতবর্ষকে যে প্রধানত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা যায় এই মতটিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে মধ্যদেশে বসতি স্থাপন করেছিল কুরু আর পাঞ্চালরা। তাদের পূর্বে ছিল কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ ও মগধ। এই দুই দেশের সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করত পুণ্ড্ররা। মধ্যদেশের পশ্চিমে ছিল সৌরাষ্ট্র। সেখানে বা তার চারপাশে বাস করত সুর, আভীর, অর্বুদ, সৌবীর এবং সৈন্ধবরা। সৌরাষ্ট্রের সংলগ্ন ছিল মালব। মধ্যদেশের উত্তরে বাস করত অম্বষ্ঠ, পারসিক, হূন, সম্ব (ইউরোপের স্লাভ?) এবং রমগণ (রোমান?)। এই যে ভারতবর্ষ তা নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ। পরাশর ও বরাহমিহির ভারতবর্ষকে 'নবখণ্ড' বা নয়টি ভেদে ভাগ করলেও ভারতবর্ষের যে ছবি তারা এঁকেছেন তা মূলত ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষের ছবি। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের আকার কূর্মের মতন যাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন কূর্মচক্র। এই চক্রে আছে নয়টি ভেদ, বরাহমিহিরের ভাষায় নয়টি 'বর্গ' যা কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্রের দশটি দিকের নয়টি দিককে নির্দেশ করে। এই দিকগুলি হল মধ্য, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব (অগ্নি), দক্ষিণ-পশ্চিম (নৈর্ঋত), উত্তর-পশ্চিম (বায়ু) এবং উত্তর-পূর্ব (ঈশান)। মধ্যদেশের অন্তর্গত প্রধান দেশ হল পাঞ্চাল, পূর্বের মগধ, উত্তর-পূর্বের পুলিন্দ, উত্তরে মদ্র, উত্তর-পশ্চিমের হরহৌর (হরহূন), পশ্চিমের সিন্ধু, দক্ষিণ পশ্চিমের অনার্ত, দক্ষিণের অবন্ত (অবন্তী) এবং দক্ষিণ-পূর্বের কলিঙ্গ। মার্কণ্ডেয় পুরাণও মোটামুটি এই বিভাগকে স্বীকার করে নিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভারতবর্ষ বা কুমারী দ্বীপকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই সাতটি ভাগের যে বর্ণনা তা পরাশর ও বরাহমিহির কথিত নয়টি ভাগ বা মহাভারত ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণের পাঁচটি ভাগ থেকে খুব বেশি অন্যরকম নয়। এই সাতটি ভাগ হল মধ্যদেশ, উদীচ্য বা উদীচী (উত্তর), প্রাচ্য (পূর্ব), দক্ষিণাপথ (দক্ষিণ), অপরান্ত (পশ্চিম), বিন্ধ্যাঞ্চল ও হিমালয় পর্বতের সংলগ্ন অঞ্চল (পর্বতাশ্রয়িনঃ)।

১১। উপরের আলোচনা থেকে এই কথাটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যে প্রাচীন আর্যরা একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষের ধারণা থেকে শুরু করলেও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তাদের অগ্রগতি ও অগ্রবিস্তারের সঙ্গে তাল রেখে তারা তাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণাকে ছোট করে আনছিলেন, কিংবা, হিমালয়ের ওপারের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য কমিয়ে এনে হিমালয় ও সমুদ্রের মধ্যে আবদ্ধ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসাকে ব্যাপক করার চেষ্টা

করছিলেন। বেদের যুগে যা অনিশ্চিত অনুমান দিয়ে শুরু হয়েছিল মহাকাব্যের যুগ পার হয়ে পুরাণের যুগে তা একরকম নিশ্চিত লাভ করল। এর ফল হল এই যে দক্ষিণ-ভারত নিয়ে তাদের চিন্তা আরও গভীর হল এবং ক্রমে এ-বিষয়ে তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানও আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

আর্য-চেতনায় দক্ষিণ ভারত

১২। দক্ষিণ ভারতকে আর্যরা সবসময় দক্ষিণ বা দক্ষিণাপথ বলে উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মত হল নর্মদা নদীর দক্ষিণাংশই হল দক্ষিণাপথ। পেরিপ্লাসের[৭] লেখক এই অঞ্চলকেই দক্ষিণাবেডস্ (Dakhinabades) বলে উল্লেখ করেছেন। সে যুগে ভারতবর্ষে প্রাকৃত বা অন্যান্য কথ্যভাষায় দক্ষিণাপথকে দক্ষিণাবদ বলা হত। গ্রিকরা হয়তো প্রাকৃত বা কথ্যভাষার উচ্চারণকেই গ্রহণ করেছিলেন। ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসে শুনতে পেয়েছিলেন যে বারানসীর দক্ষিণে একটি দেশ আছে যার নাম তা-সিন্ (Ta-Thsin)[৮]। চিনা ভাষায় 'তা' শব্দের অর্থ হল বড় এবং 'সিন্' শব্দের অর্থ হল নূতন—অর্থাৎ বড়ো নূতন দেশ। তা-সিন্ সংস্কৃত দক্ষিণ [দক্ষিণ] শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মার্কণ্ডেয়, মৎস্য ও বায়ুপুরাণে দক্ষিণাপথের তিনটি অঞ্চলকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল। তাঞ্জোর, মাদুরা ও মালাবার হল এই তিনটি অঞ্চল। মহাভারতে বলা হয়েছে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব দক্ষিণাপথে রাজ্যবিজয় করতে গিয়েছিলেন এবং যাবার আগে পাণ্ড্যরাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তাহলে মহাভারতের যুগে পাণ্ডরাজ্য দক্ষিণাপথের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু পুরাণের সময় হয়েছিল। এইভাবে মহাভারত থেকে পুরাণের যুগে দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে আর্যদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সেখানকার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করাও তাদের পক্ষে সহজ হচ্ছিল।

১৩। মনে রাখা দরকার যে প্রাচীন আর্যরা অনেকদিন পর্যন্ত বিন্ধ্য পাহাড়কে তাদের কল্পিত দক্ষিণাপথের উত্তর সীমা এবং তাদের প্রিয় ব্রহ্মাবর্তের বা পুণ্যভূমির দক্ষিণ সীমা বলে মনে করতেন। ব্রহ্মাবর্ত হল সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর (থানেশ্বরের কাছে) মধ্যবর্তী অঞ্চল। ব্রহ্মাবর্তের প্রসারিত ভৌগোলিক অবস্থান হল মধ্যদেশ, আর তার প্রায় সমার্থক হল মনু, পাণিনি ও পতঞ্জলি কথিত আর্যাবর্ত। এরই দক্ষিণে বিন্ধ্য পাহাড়, পারিযাত্র,

৭. Periplus Maris Erythraei (The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea)—এই গ্রন্থের লেখকের নাম জানা যায় না। তবে তিনি সম্ভবত মিশরবাসী গ্রিক ছিলেন। ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে গ্রিক ও রোমানরা Erythraean Sea বলতেন।

৮. সংস্কৃতে সিন্ শব্দের অর্থ হল গ্রাম।

যেখান থেকে চম্বল ও বেত্ব (বেত্র বা বেত্রবতী?) নদী তাদের যাত্রা শুরু করেছে। এই পাহাড়কে অতিক্রম করেই অগস্ত্য ঋষির দক্ষিণে যাত্রা। এরপর থেকে বিন্ধ্য আর আর্য গৌরব রবির দক্ষিণায়ণের পথ আটকে দাঁড়াতে পারেনি। অগস্ত্য ঋষির দক্ষিণে অভিযান বোধহয় শেষ হয়েছিল বিদর্ভ বা বেরারে। এইখানেই তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই হল দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন আর্যবসতি। রামায়ণের বর্ণনা থেকে মনে হয় এর নীচেই ছিল দণ্ডকারণ্য। শ্রীরাম স্বয়ং দণ্ডকারণ্যের অন্তর্ভুক্ত গোদাবরীর সন্নিকটে পঞ্চ বটীতে কিছুকাল বাস করেছিলেন। এই স্থান থেকে দুই যোজন দূরে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। মহাভারতেও উল্লিখিত আছে যে ঋষি অগস্ত্য তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে একটি কন্যার জন্মদান করেন এবং পরে বিদর্ভরাজের কাছে তাকে সমর্পণ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে দণ্ডকারণ্যের আগে বিদর্ভই ছিল আর্যদের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ বসতি। এই দণ্ডকারণ্য অঞ্চ লটি ছিল বর্তমান মহারাষ্ট্র। এর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হত গোদাবরী নদীর জল। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী কোন তর্পণ, সঙ্কল্প অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মন্ত্র উচ্চারণের সময় দেশ, তিথি, পিতৃপুরুষের নাম ইত্যাদি বলে নিতে হয়। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণরা মন্ত্রোচ্চারণের আগে 'মহারাষ্ট্র' বলেন না, বলেন 'দণ্ডকারণ্য'। আর তার সঙ্গে যোগ দেন 'দেশ'। অতএব মহারণ্যময় দণ্ডকরাষ্ট্রই হল মহারাষ্ট্র। রামায়ণে কথিত পঞ্চ বটী হল বর্তমান নাসিক। মধ্যদেশের অন্তর্গত অযোধ্যা থেকে গোদাবরীর তীরে দণ্ডকারণ্যে আসা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাসনই বটে। রামায়ণের যুগে সম্ভবত এই অঞ্চ লে আর্যরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিলেন। রামায়ণ ও ভবভূতির উত্তররামচরিতে গোদাবরীর তীরবর্তী অঞ্চ লকে যে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে তা বসতিহীন ভয়ঙ্কর অরণ্যের ছবি হতে পারে না। পুরাণেও এই অঞ্চ লকে সুন্দর করে আঁকা হয়েছে। সস্ত্রীক শ্রীরামচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য ঋষি ভরদ্বাজ এখানে তরুলতাশোভিত এক উদ্যান রচনা করেছিলেন। এখানে গোবর্ধন বলে একটি পাহাড় ছিল। তার উল্লেখ আছে বায়ু ও মৎস্যপুরাণে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গোবর্ধনকে একটি নগর বলা হয়েছে। হয়তো বা পর্বতের পাদদেশে অরণ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে আর্যদের বসতি গড়ে উঠছিল। সুদূর অতীতের এই গোবর্ধনই হল এখনকার নাসিক।

১৪। বিন্ধ্য পাহাড়ের দক্ষিণের ভারতবর্ষকে আর্যরা বেদের যুগ থেকেই জানার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মহাকাব্যের যুগের আগে সম্ভবত তাকে ভালো করে জানতে পারেননি। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির একটি হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থে অনধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি জাতিগুলিকে আর্যমণ্ডলের উপান্তে দেখানো হয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের উত্তরপুরুষরা শাপগ্রস্ত হয়ে আর্যমণ্ডলের সীমান্তের বাইরে এইসব অঞ্চ লে বাস করতেন এবং অবশেষে তারা দস্যুতে রূপান্তরিত হন এ-কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে। রামায়ণে পুণ্ড্রজাতিকে এবং পুরাণে অনধ্র, শবর ও পুলিন্দ জাতিকে

দক্ষিণের জাতি বলা হয়েছে। এই সমস্ত জাতিগুলি দণ্ডকারণ্যের পাশে বা তার নীচে ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি ধরে নিই রামায়ণের কথা ঠিক—দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসরা থাকত, আর তারা যখন-তখন এসে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে গোলমাল বাঁধাত—তবে বলতে হবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগ থেকে রামায়ণের যুগ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে আর্যবসতি খুব বেশি বিস্তারলাভ করেনি। আর্য-ভারতবর্ষ ও অনার্য-ভারতবর্ষের ভেদ বিন্ধ্য পর্বত দিয়েই চিহ্নিত হত। আমরা আগেই দেখেছি যে এক বৃহত্তর ভারতের মধ্যে এক ক্ষুদ্রতর ভারতের ছবি আর্যচেতনায় ধরা দিয়েছিল, আর সেই ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষকে দুটি কৃষ্টিমণ্ডলে তারা বিভক্ত করলেন, উত্তর ভারতের প্রসারণশীল আর্যকৃষ্টিমণ্ডল এবং দক্ষিণ ভারতের ক্রমসঙ্কোচনশীল অনার্যকৃষ্টিমণ্ডল। ঋষি অগস্ত্য সম্ভবত প্রথম আর্য যিনি অনার্য ভারতে, অনার্যকৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

১৫। পাণিনি উত্তর ভারত সম্বন্ধে যথেষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরব। অবন্তী, কোশল, কলিঙ্গ প্রভৃতিকে তিনি দক্ষিণের রাজ্য বলেছেন। অবন্তী হল পরবর্তী উজ্জয়িনী। কলিঙ্গ হল ইংরাজযুগের উত্তরসরকার, বর্তমান উড়িষ্যা-অন্ধ্রের সীমান্ত। অবন্তী ও কোশলকে পুরাণে বিন্ধ্য পর্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত দুটি দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রত্নাবলী নাটকেও কোশলকে বিন্ধ্য পর্বতের সংলগ্ন অঞ্চল বলা হয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের ওপারে প্রকৃত দক্ষিণকে পাণিনির লেখায় পাওয়া যায় না। অথচ পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণে নামার পথে কলিঙ্গকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, আর্যরা দক্ষিণে এসেছিলেন কী করে—বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে, অর্থাৎ অগস্ত্য যাত্রার পথ ধরে, নাকি বিন্ধ্য পর্বতকে এড়িয়ে পূর্বদিক দিয়ে যেপথে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পথে?

১৬। বিন্ধ্য পর্বতকে অতিক্রম করলে পাওয়া যাবে বিদর্ভ ও দণ্ডকারণ্য। পাণিনির রচনায় এই অঞ্চলগুলির কোন উল্লেখ নেই। কাত্যায়ন মহিষ্মৎ নামে একটি স্থানের উল্লেখ করেছেন। এইটিই হল পুরাণের মহিষক, বর্তমানের মহারাষ্ট্র। রামায়ণের দণ্ডক রাজ্য যা বসতিবিহীন রাক্ষসাকীর্ণ, অরণ্যময়। মহিষ্মৎ কথাটির অর্থ হল যে দেশে মহিষ পাওয়া যায়। ব্যাকরণের যে নিয়ম অনুসারে এই শব্দটির উৎপত্তি সে নিয়মটি পাণিনির দেওয়া। যে দেশে কুমুদ বা পদ্ম পাওয়া যায় সে দেশকে পাণিনি বলেছেন কুমুদ্বৎ, যে দেশে নড় বা নলখাগড়া পাওয়া যায় তাকে বলেছেন নড়বৎ, যে দেশে বেত পাওয়া যায় সে দেশকে বলেছেন বেতস্বৎ ইত্যাদি। এই অর্থে কাত্যায়ন মহিষ্মৎ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এইভাবে সংস্কৃতের 'বতুপ্', 'মতুপ' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার করে কোন দেশ, সেই দেশের মানুষ, রাজপুরুষ ইত্যাদিকে বোঝানোর নিয়ম পাণিনি তার ব্যাকরণে দিয়ে গেছেন। মহিষ্মৎ বা মহারাষ্ট্রকে তিনি উল্লেখ করেননি। এটি যে ইচ্ছাকৃত তা বলা যাবে না, কারণ উত্তর ভারতের এত অসংখ্য স্থানের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এবং স্থান,

কাল, পাত্র সম্বন্ধে ব্যাকরণের নিয়ম এমন আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি জানতেন, অথচ লেখেননি একথা গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। সম্ভবত তিনি জানতেন না। এর মানে হল এই যে পাণিনির সময় পর্যন্ত অগস্ত্যঋষির বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রমের ঘটনাটি ঘটেনি এবং ততদিন পর্যন্ত আর্যরা বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত স্থানের মধ্যে বাস করতেন। পাণিনির সময় আর্যরা যে দক্ষিণ ভারতকে স্পষ্ট করে জানতেন না তার আরও একটি উদাহরণ পাণিনির লেখা থেকেই দেওয়া যায়। কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন মানুষ বা তাদের রাজাকে কিভাবে নির্দেশ করতে হবে তার নিয়ম পাণিনি দিয়েছেন। যেমন পঞ্চাল দেশের বা পঞ্চালজাতির কোন মানুষ বা রাজাকে বলা হবে পাঞ্চাল। অনুরূপভাবে শাল্বজাতি থেকে আমরা পাব শাল্বেয়—শাল্বজাতির কোন মানুষ বা তাদের রাজা। পাণিনির লেখায় একটি জাতির অনুল্লেখ কাত্যায়ন লক্ষ্য করেছেন। তিনি তা যোগ করে দিলেন—পাণ্ডু থেকে হবে পাণ্ড্য—পাণ্ডুজাতির কোন মানুষ বা তাদের রাজা। কিন্তু পাণিনি বলেছেন উত্তর-পশ্চিমের (অনার্য) জাতি কম্বোজ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটবে না। কম্বোজ অর্থে সেই (অনার্য) জাতি, তার মানুষ বা তাদের রাজাকে বোঝাবে, সেখানে স্বরবর্ণকে পরিবর্তন করা চলবে না। কাত্যায়ন বললেন, চোলদেরও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পাণ্ডু, চোল প্রভৃতি দক্ষিণের জাতিগুলিকে পাণিনি জানতেন না। কাত্যায়ন জানতেন। তিনি নাসিক্য বলে একটি স্থানের উল্লেখ করেছেন। সেটি বর্তমান নাসিক বলে অনুমান করা হয়।

১৭। দক্ষিণভারত সম্বন্ধে পতঞ্জলির জ্ঞান ছিল অনেক বেশি প্রসারিত। তিনি ছিলেন বৈয়াকরণ। অতএব, দক্ষিণভারতের ভাষাকে বোঝা তিনি বৈয়াকরণের কর্তব্য বলে মনে করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন দক্ষিণভারতের লোকেরা 'সরসী' বলতে বড় জলাশয়কে বোঝায়। বৈয়াকরণের নিষ্ঠা বজায় রাখতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তাঁর লেখায় আমরা কয়েকটি স্থানের উল্লেখ পাই—মহিষ্মতী, বৈদর্ভ, কাঞ্চীপুর ও কেরল। অর্থাৎ বিদর্ভ হয়ে মহারাষ্ট্র ও কাঞ্জেভরম হয়ে মালাবার পর্যন্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে পতঞ্জলি জানতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, মহিষ্মৎ, বিদর্ভ প্রভৃতি অনার্য অঞ্চলের নামের সঙ্গে তিনি ষ্ণ (অন্), মতুপ্ (মৎ বা মান), নীপ্ (ঈপ্) ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত করেছেন। মাহিষ্মতী, বৈদর্ভ প্রভৃতি নামগুলির ব্যুৎপত্তি পাণিনির ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ঘটেছে। পতঞ্জলির আবির্ভাব ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সালে। তাহলে কি এই সময়ের মধ্যেই দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল সংস্কৃত বা আর্যকৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে চলে এসেছিল? কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পাণিনির সময় হল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। কারও মতে তারও আগে। কেউ কেউ বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হল কাত্যায়নের কাল। মোটকথা পাণিনির সময় থেকে কাত্যায়নের কাল হয়ে পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত বেশ কয়েকশো

বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে আর্যরা দক্ষিণভারতকে অনেকখানি জানতে পেরেছিলেন, পাণিনির সময় থেকে কাত্যায়নের সময় পর্যন্ত দক্ষিণভারত সম্বন্ধে আর্যচেতনার যে বিবর্তন তার অনুসন্ধান করেছেন অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার (Goldstucker)। কাত্যায়ন থেকে পতঞ্জলি পর্যন্ত বিবরণকে লক্ষ্য করেছেন ভাণ্ডারকার। ঐতিহাসিকদের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে মৌর্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই বা তার অব্যবহিত পরের যে-কাল তার মধ্যেই দক্ষিণভারতের এক বৃহৎ অংশ আর্যকৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে চলে এসেছিল। ভাণ্ডারকার বলেছেন যে দক্ষিণভারতকে জানতে আর্যদের কম করেও সাতশো বছর বা তারও বেশি সময় লেগেছিল। তিনি বলেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী বা তারও পূর্বের কোন সময়কে যদি পাণিনির কাল বলে ধরা যায়, আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে পতঞ্জলির সময়ের (খ্রিঃপূঃ ১৫০ সাল) আগে দক্ষিণভারতকে জানা আর্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাহলে বলতে হবে যে কম করেও সাতশো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আর্যরা দক্ষিণভারতকে জেনেছিলেন। এর মধ্যে কাত্যায়নের সময় থেকে পতঞ্জলির সময়ের মধ্যে তাঁদের এ জানা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। ভাণ্ডারকার বলেছেন এ সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় তিনশো বছর। মোট কথা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আগে আর্যরা পূর্বদিক দিয়ে ঘুরে বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত বিন্ধ্যপর্বতের ঠিক দক্ষিণের অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালের মধ্যেই মাদুরা ও তাঞ্জোর পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট অঞ্চল আর্যচেতনায় ধরা দিয়েছিল। কাত্যায়নের রচনায় তার আভাস আছে। ভারতবর্ষে মৌর্যশাসন আরম্ভ হবার সময় থেকেই এই চেতনা স্পষ্ট হতে থাকে।

আর্য-চেতনায় বাংলাদেশ

১৮। দক্ষিণভারতের মতো বাংলদেশকে জানতেও আর্যদের অনেক সময় লেগেছিল। বেদের সূত্রগুলিতে বাংলাদেশের কোন বর্ণনা নেই। বৈদিক আর্যরা খুব বেশি হলেও ভাগলপুর পর্যন্ত ভারতের পূর্বসীমাকে কল্পনা করতে পেরেছিলেন। আর্যভারতের বাইরে পূর্বদিকে কিছু সংখ্যক অনার্যজাতির বসতির কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে, বাংলাদেশের আভাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। এই অনার্যজাতিদের 'দস্যু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত জাতিদের মধ্যে একটি হল পুণ্ড্র। পুণ্ড্রনগর বলে একটি স্থানের অবস্থানের কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে আমরা জানতে পারি। পুণ্ড্রদের মতো আরেকটি অনার্যজাতি হল বঙ্গ। ঐতরেয় আরণ্যকে তার উল্লেখ আছে। বঙ্গদের সরাসরি 'দস্যু' বলা না হলেও তাদের বিধিবঞ্চিত জাতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

১৯। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সার্থক জ্ঞানের সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মসূত্রগুলিতে। বৌধায়ন ভারতবর্ষকে যে কয়টি কৃষ্টিমণ্ডলে বিভক্ত করেছেন তার প্রথম ও প্রধানটি হল

আর্যাবর্ত, অর্থাৎ মধ্যদেশীয় কৃষ্টিমণ্ডল। সবচেয়ে শেষেরটি এবং নিকৃষ্টতমটি হল উপান্তের কৃষ্টিমণ্ডল যার মধ্যে আছে পাঞ্জাবের আরট্টজাতি, দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকার সৌবীরজাতি, বাংলাদেশের উত্তরের পুণ্ড্রজাতি, বাংলাদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বঙ্গজাতি এবং উড়িষ্যার কলিঙ্গজাতি। এই জাতিগুলিকে আর্যকৃষ্টিমণ্ডলের পরপারের জাতি বলা হয়েছে। দৈবাৎ এদের মধ্যে এসে পড়লে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। অথচ এদেরই পাশাপাশি মালওয়া বা মালব, পূর্ব ও দক্ষিণ বিহার, দক্ষিণ কাথিয়াওয়ার, নিম্নসিন্ধু উপত্যকা ইত্যাদির অধিবাসীদের অপবিত্র বলা হয়নি। এই অঞ্চলগুলি ছিল মধ্যদেশ বা আর্যাবর্তকে ঘিরে। তাই এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আর্যরা সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গ, পুণ্ড্র, আবট্ট, সৌবীর ইত্যাদি জাতিগুলি সম্বন্ধে বৈদিক আর্যরা বেশি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি। তাই তখন পর্যন্ত তাদের আর্যকৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি।

২০। রামায়ণ ও মহাভারতে বাংলাদেশকে খুব তাচ্ছিল্য করা হয়নি। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত মানুষদের সঙ্গে বঙ্গজাতির লোকেরা যে নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে রামায়ণে। মধ্যমপাণ্ডব ভীমের বাংলাদেশ বিজয়ের কথা মহাভারতে বলা আছে। তিনি পুণ্ড্র ও বঙ্গজাতিকে পরাজিত করে তাম্রলিপ্তের রাজাকে আক্রমণ করেন। তিনি সুহ্মদেশও (বর্তমান হুগলী জেলা) অধিকার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বাংলাদেশের উত্তরাংশ (পুণ্ড্র), পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল (বঙ্গ) এবং মধ্য-পশ্চিম (সুহ্ম) খণ্ডে আর্যদের আসার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর্যদের পুরাতন ধারণার মধ্যে এগুলি নূতন সংযোজন। এই সংযোজনগুলি নিয়ে যে ভারতবর্ষ তাই হল মহাভারত। এইরকম আরো একটি সংযোজন হল লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী অঞ্চল)। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে এক বৃহত্তর ভারতবর্ষের চেতনা থেকে আর্যরা ধীরে ধীরে এক ক্ষুদ্রতর ভারতের চেতনায় পৌঁছেছিলেন। হিমালয় পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ যখন পরিপূর্ণভাবে আর্যচেতনায় প্রতিফলিত হতে লাগল তখনই মহাভারতের চেতনার উন্মেষ ঘটল। আসলে রামায়ণ থেকেই শুরু হয়েছিল এই উন্মেষ। রামায়ণে সমৃদ্ধ জনপদগুলির যে উল্লেখ আছে তার মধ্যে বঙ্গেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতে পুণ্ড্র ও বঙ্গজাতিকে 'সুজাত' ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, আর্যরা যখন কোন অনার্যজাতিকে আর্যমণ্ডলে স্থান দিতেন তখন তাকে তারা খুব বেশি হলেও ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না। এইটিই ছিল অনার্যদের আর্যভুক্তির নিদর্শন। পুণ্ড্র বা বঙ্গজাতিকে যে শূদ্র বলা হয়নি তার থেকেই বোঝা যায় যে তারা আর্যদের কাছে কিছুটা মর্যাদা পেয়েছিল। এই মর্যাদা পাওয়ার ঘটনা থেকে এও বোঝা যায় যে উপরোক্ত দুই জাতির আর্যভুক্তির ঘটনাটি খুব সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। মহাভারতের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে একথা তো স্পষ্টই বলা আছে যে করতোয়া নদীর তীর এবং গঙ্গাসাগর

সঙ্গম হল পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। করতোয়া নদী উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলের মানুষদের আর্যরা মেনে নিতে পারেননি। মহাভারতেও তাদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। ম্লেচ্ছ, দাস, দস্যু ইত্যাদি শব্দগুলি বেদের যুগ থেকেই আর্যদের খুব প্রিয় বিশেষণ ছিল যা অনার্যদের সম্বন্ধে যত্রতত্র ব্যবহার করতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এর মধ্যে ম্লেচ্ছ, দস্যু ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আর্যরা সেইসব অনার্যদেরই বোঝাতেন যাদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল কম। যেমন পরবর্তীকালে বিদেশী মানুষকে 'যবন' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হত। দাস শব্দটি কিন্তু ম্লেচ্ছ বা দস্যু এই অর্থে ব্যবহৃত হত না। কী ব্যাপক ও গভীর অর্থে দাস শব্দটি ব্যবহৃত হত তা দেবরাজ চান্না তাঁর *Slavery In Ancient India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন। যেসব অনার্যরা আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে, তাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের আধিপত্যকে মেনে নিজেদের কায়িক শ্রম দিয়ে আর্যসমাজের কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে রাখত, তাদের আর্যরা দাস বলতেন। এই অর্থে পুণ্ড্র বা বঙ্গজাতি কখনও দাস বা দস্যু ছিল না। এই তথ্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২১। মহাভারতে বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলের মানুষদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে—এ-কথাটির অর্থ হল পূর্বদিকে অনার্য ভারতের আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে শুধুমাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলেই সীমিত হয়ে এসেছিল। আর তার সঙ্গে আর্য-ভারতের সীমানা প্রসারিত হয়ে সমুদ্রোপকূলের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই অন্তর্দেশীয় ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রোপকূলের দিকে, মধ্যদেশ থেকে দক্ষিণাপথ ও প্রাচ্যের দিকে, গাঙ্গেয় উপত্যকার পরিচ্ছন্ন আর্যভূমি থেকে দূর-দূরান্তে অনালোকিত অনার্যলোকে ব্যাপ্ত যে দেশ তা ক্রমেই আর্যচেতনায় একটি মহাদেশের রূপ নিচ্ছিল। এই ক্রমশ উন্মোচনশীল মহাদেশেই হল মহাভারত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের ভারতকে দেখেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। লৌহিত্য পর্যন্ত পূর্বভারতকে দেখেছিলেন মধ্যমপাণ্ডব ভীম। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপাকার যে ভারতবর্ষ, যেখানে আর্য শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ অনার্যদের সহাবস্থান, তাকে যিনি পরিপূর্ণভাবে জেনেছিলেন তিনি হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। এই জানার সূচনা রামায়ণে, আর তার পরিণতি মহাভারতে। রামায়ণে যার প্রস্তাবনা, দ্বৈপায়ণের লেখায় যার উপস্থাপনা সেই মহাভারতের আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী রূপটি পরবর্তীকালে পুরাণে আরও প্রকৃষ্টভাবে বিধৃত হল। পুরাণ তাই পুরাভারতের দর্পণ। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা পাই মূলত জাতি-উপজাতি, ধর্ম ও সমাজের সমাহারের ভারতকে। পুরাণে পাই সমুদ্র ও পাহাড়ের সংলগ্ন এবং দুয়ের মাঝে আবদ্ধ অখণ্ড ভৌগোলিক ভারতকে। সবমিলিয়ে যে ভারতবর্ষ তাকেই প্রাচীন আর্যরা যুগ যুগ ধরে জানার চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো সার্থকভাবে জানতেও পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মতত্ত্ব

২২। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রাদিতে ধর্ম কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি সর্বত্র ধর্ম ছিল স্বীকৃত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে ধর্ম ছিল একটি গ্রাহ্য ও পালনীয় বিষয়। অশোকের শিলালিপিতে 'ধম্ম' কথাটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিশ্বাস সম্মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রচনা করে, অর্থাৎ ধর্ম বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন ভারতে সে অর্থে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়নি। ইহলোক-পরলোকের বিশ্বাস নয়, ঈশ্বরসাধনার বায়বয়িতা নয়, জাগতিক অস্তিত্বের পরপারে পলাতক, অস্পষ্ট, জীবনসাধনা নয়—ধর্ম ছিল প্রতিনিয়তের বিষয়, ব্যক্তির জীবনচর্যার নিয়ম, সমাজকে ধারণ করার আইন, শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল রাখার অনুশাসন, জীবনপালনের বিধি। অতএব ধর্ম কথাটির অর্থ ছিল অনস্বীকার্য।

২৩। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে ভারততত্ত্বের পর্যালোচনা পাশ্চাত্যে আরম্ভ হয়েছিল তাতে এই ধর্ম কথাটিতে বিকৃত করা হয়েছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। একথা বলেছেন সালেতোর। অধ্যাপক হাইনরিশ ৎসিমার (Heinrich Zimmer) ধর্ম শব্দটির মধ্যে স্বর্গের বিধি ও মর্ত্যের নিয়ম ছাড়া অন্য কোন অর্থ খুঁজে পাননি। ১৮৭৯ সালে এই জার্মান পণ্ডিতের মত প্রকাশিত হয়।[৯] মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের অবশিষ্ট দু'দশক ধরে এই মত টিকে ছিল।[১০] এই মতের উপর সালেতোর যে টীকা দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য[১১] : [No fact of argument is needed to discard this fantastic

৯. ৎসিমার সাহেবের গ্রন্থ *Altindischen Leben* ১৮৭৯ সালে বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

১০. Rudolph Von Jhering এই একই মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর *The Evolution of the Aryan* গ্রন্থে (পৃঃ ৫০)। এ-গ্রন্থের অনুবাদক A. Drucker এবং তা প্রকাশিত হয় লন্ডনে, ১৮৯৭ সালে।

১১. B. A. Saletore, *Ancient Indian Political Thought and Institutions (1963), P. 11.*

interpretation of ***dharma*** which the later Western Indologists themselves have refused to accept. The ancient Indians were not so unrealistic as to invent a term which was to cover the entire world or the earth and heaven together ! One may venture to think that Professor Zimmer was misled in his interpretation of dharma perhaps because the word ***dharman*** was read in the ancient texts in conjunction with the term *rita*, meaning 'external order.'

২৪। ৎসিমার ধর্ম শব্দের যে-অর্থ দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে 'ঋত' শব্দের ব্যাখ্যা। ঋগ্‌বেদে 'ঋত' শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দের অর্থ হল সত্য, পরব্রহ্ম, কর্মফল ইত্যাদি। মর্ত্য কর্ম ও অমর্ত্য ফল, জাগতিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অতিজাগতিক অভিব্যক্তি, ইহলোকের সাধনায় লোকোত্তরের ব্যঞ্জনা—সবমিলিয়ে যে বৃহত্তর জীবনবোধ, জন্ম থেকে জন্মান্তরের ব্যবস্থা যার প্রাণকেন্দ্রে আছেন পরব্রহ্ম বা নিত্যসত্য তাকেই বলা হয় 'ঋত'। ৎসিমারের ধর্ম আসলে ঋষিদৃষ্ট 'ঋত'। ৎসিমার থেকে শুরু করে ম্যাক্সমুলার পর্যন্ত জার্মান পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যার অন্তর্লোকে এক ধারাবাহিক ধর্মীয় ভাববাদ বা সে জাতীয় কোন অস্পষ্ট আবেগকে এত বেশি গ্রাহ্য মনে করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতের বস্তুনিষ্ঠ, জাগতিক জীবন বোধের দৃষ্টিকোণটি তাঁদের চোখে ধরা পড়েনি। এই কারণে তারা দণ্ডনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির যোগটিকেও বুঝতে পারেননি। দণ্ড বলতে ৎসিমার বুঝেছিলেন লাঠিরূপ হাতিয়ারকে যা প্রকৃতপক্ষে একটি 'শোধক' (Corrective), বিচারের প্রতীকচিহ্নমাত্র। তাঁর ধারণা ছিল দণ্ড যুক্ত থাকত 'দ্রুপদ' বা একটি কাষ্ঠস্তম্ভের সঙ্গে। এর সঙ্গে অপরাধীকে বেঁধে শাস্তি দেওয়া হত। এর কারণ সম্ভবত এই যে প্রাচীন ভারতে কোন কারাগার বা কোন রকম বন্দীশালার ব্যবস্থা ছিল না। একথাটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়। যে কাষ্ঠস্তম্ভের কথা ৎসিমার বলেছেন তা প্রধানত যজ্ঞের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষকে যে সময় বিশেষে কাষ্ঠস্তম্ভে সংলগ্ন করা হত না তা বলা যাবে না।[১২] কিন্তু এটি ছিল একটি বিরল প্রথা। তা দিয়ে দণ্ড শব্দটির ব্যাখ্যা করা চলে না। অনুরূপভাবে ধর্ম শব্দটির সঠিক অর্থ ৎসিমার বুঝতে পারেননি। নাকি বোঝার মতন দৃষ্টিকোণ ভারততাত্ত্বিক জার্মান পণ্ডিতদের ছিল না? পাশ্চাত্যে রোমান আইনের (Roman Law) উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা সেখানকার মানুষের মনে এত বদ্ধমূল ছিল যে প্রাচীন ভারতের আইন ব্যবস্থার

১২. ঋগ্‌বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে বর্ণিত শুনঃশেপ-র ঘটনা এর প্রমাণ। "শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও তিনপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল"—ঋগ্‌বেদ, প্রথম মণ্ডল, ২৪ সূক্ত, ১২ ঋক। বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত। এই তিনপদ কাষ্ঠই কি ক্রুশ্ (cross)?

হীনতাকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত অন্তত তাই মনে করেন।

২৫। আরেক জন জার্মান ভারততত্ত্ববিদ ধর্ম কথাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সমান ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি হলেন ভিন্টারনিজ (M. Winternitz)। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রকে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অংশ বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে ধর্ম ও অর্থ রাজপুরুষদের শিক্ষার বিষয় ছিল।[১৩] এর থেকে একথা অনুমান করলে ভুল হবে যে সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ধর্ম কথাটিকে বুঝতে পারেননি। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল (Macdonell) ও অধ্যাপক কীথ (Keith) বরং কিছুটা সঠিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক আইন (Civil law), নৈতিকতা (morality), ধর্ম (religion) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ম্যাকডোনেল ধর্ম কথাটির ব্যবহার দেখতে পেয়েছেন।[১৪] প্রথা (custom), আইন (law), শুদ্ধাচার (righteous conduct) ইত্যাদি অর্থে ধর্ম কথার ব্যবহার দেখেছেন কীথ। এই দুই পণ্ডিত যে ধর্ম কথাটির সংজ্ঞা দেবার বিষয়ে খুব নিশ্চিত ছিলেন তা নয়। তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে কীথ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ধর্মশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে আইনের বনিয়াদ রূপে কর্তব্য ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণটি রচনা করে। একথার মধ্য দিয়ে কীথ ধর্ম শব্দটির অর্থগত ও ব্যবহারগত ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এই ব্যাপকতা ও গভীরতা থেকে এসেছে সংজ্ঞাগত অনিশ্চিতি। অধ্যাপক কীলহর্ণ (Kielhorn) এই অনিশ্চয়তাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে ধর্ম কথার সমার্থক ইংরাজি শব্দ তার জানা নেই।[১৫] এই মত তিনি একা পোষণ করেননি। কোন কোন মহলে এটি একটি স্বীকৃত মত।[১৬]

১৩. ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে Calcutta Review-তে প্রকাশিত M Winternitz-এর 'Kautiliya Arthasastra' পৃ. ২৩।

১৪. ঋগ্বেদে দুটি শব্দ পাওয়া যায় 'ধামন্' ও 'ধর্মন্'। ধামন্ কথার অর্থ হল গৃহ বা তার বাসিন্দা। কখনো কখনো আইন (law), বিধি (ordiance) এই অর্থেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যে-অর্থে ধর্মন্ কথাটির ব্যবহার হয়েছে—A. A. Macdonnell ও A. B. Keith সম্পাদিত Vedic Index of Names and Subjects, I. P. 39। Sir Monier Monier-Williams-এর ১৮৭২ সালে প্রকাশিত *A Sanskrit English Dictionary*-তে Law ordinance, decree, statute, usage, practice, duty, justice, right, virtue, morality, religion, conduct এই অর্থে ধর্মন্ এবং House, abode, the inmates of a house, members of a family, state, condition, manner, law, rule, established order এই অর্থে ধামন্ শব্দের ব্যবহার সূচিত হয়েছে।

১৫. 'I find no English word by which I can fully express all the meanings of the Sanskrit *dharma.*' – F. Kielhorn, *Epigraphia Indica,* ix, p. 113, n (7).

১৬. P. V. Kane (*The History of the Dharmasastras, I,* p. 1) এই মত স্বীকার করেন।

২৬। এখন প্রশ্ন হল ধর্ম শব্দের এই সংজ্ঞাগত অনিশ্চিতি কি শুধুমাত্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেই দেখা যায়? বোধ হয় না। ভারতীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিকোণের মধ্যেও একটা আচ্ছন্নতা ছিল। অধ্যাপক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার-এর মত আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় পণ্ডিতরাও ধর্ম কথার প্রকৃত সংজ্ঞা বিষয়ে কত অনিশ্চিত। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার-এর বিখ্যাত গ্রন্থ হল *Some Aspects of Ancient Indian Polity*। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের নানাবিধ দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি কোন স্থির বিষয়কে বোঝেননি। তাঁর কাছে ধর্মের অর্থ কখনো গুণ (virtue), কখনো বিধান বা বিধি (precepts), কখনো বা শাস্ত্রীয় আইন (canonical laws)। এক জায়গায় ধর্ম বলতে তিনি শাস্ত্রীয় আইনকে বুঝছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন ধর্ম কথার অর্থ নিশ্চিত নয় ('never very definite')। ধর্মকে তাই তিনি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন : সদ্‌ধর্ম বা সাধারণ নীতিজ্ঞান (ordinary equity and morality), অসাধারণ ধর্ম যার মধ্যে আছে বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম বা বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের ধর্ম), গুণধর্ম বা সদাচার ও সদভ্যাসের ধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম বা প্রাত্যহিকতার ধর্ম। ধর্মের এই বিভাজনের একটির সঙ্গে অন্যটি অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যায়। তাই বিষয়টিকে স্বচ্ছ করার জন্য ধর্মকে তিনটি সহজভাগে বিভক্ত করতে হয়েছে : আচার ধর্ম অর্থাৎ যে ধর্ম সঙ্গত এবং যার প্রচলন আছে, ব্যবহার ধর্ম বা বৈষয়িকতার নিয়ম ও প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম বা নিজ কর্ম অনুযায়ী শাসিত ও দণ্ডিত হবার ধর্ম। অধ্যাপক আয়েঙ্গারের এই ধর্মতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতের ছায়ায় রচিত হয়েছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতে কোথায় কীভাবে ধর্মকে প্রয়োগ করা হত তা অধ্যাপক আয়েঙ্গারের বর্ণনা পড়লে অনুমান করা যায়। এইদিক থেকে এই আলোচনাকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের প্রকৃষ্ট আধুনিক ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শন ও সমাজতত্ত্বে law, virtue, custom, religion, charity, penance, piety, duty, quality, justice, morality, ethics ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্য দিয়ে যে সমস্ত ভাব বোঝায় তার প্রত্যেকটি কোন না কোন প্রসঙ্গে কোন না কোন ভাবে প্রাচীন ভারতে ধর্ম কথার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতি বা নীতিশাস্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রাচীন ভারতে কল্পনা করা হয়েছিল যা পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মনীষার দান। অধ্যাপক আয়েঙ্গার ধর্মের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করলেও এই দিকটিতে আলোকপাত করেননি। ধর্মকথার ব্যাখ্যায় তার অনিশ্চিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ত্রুটি। ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতির সংশ্লেষকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

২৭। অনান্য যেসব পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন তাঁরা কেউই বোধহয় সংজ্ঞার অনিশ্চিতি কাটাতে পারেননি। ডঃ কানে (P. V. Kane) তাঁর *The History of Dharmasastras* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ধর্মশাস্ত্রের সংজ্ঞা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন শাস্ত্রে ধর্মকে নানাবিধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কখনও ধার্মিকতা বা ধর্মীয় গুণ (religious merit), কখনও ধর্মীয় আইন বা আচার (religious ordinances or rites), কখনও ব্যবহার বা আচরণের নিয়ম (principles of conduct), কখনও বা আশ্রম ধর্মের কর্তব্য। ধর্ম শব্দের এই ব্যাপক ব্যবহারকে অন্যরাও স্বীকার করেছেন। প্রথা ও আচারের (customs and usage) সঙ্গে ধর্মকে সমার্থক কল্পনা করার পর কোন পণ্ডিত তাকে সমাজের আইন (public law) বলে বর্ণনা করেছেন।[১৭] সমাজের আইনই হোক, বর্ণাশ্রমের নিয়মই হোক বা গার্হস্থ্য জীবনের পালনীয় কর্তব্যই হোক, ধর্ম মানবজীবনের নীতি, স্বর্গীয় অনুশাসন নয়। ভারতীয় পণ্ডিতরা অন্তত তা-ই মনে করেন। ৎসিমার (Zimmer), ইয়েরিং (Jhering), ভিন্টারনিজ (Winternitz) প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতরা ধর্মের মধ্যে যে অলৌকিক বা অতিলৌকিকের আভাস দেখেছিলেন তা বোধহয় ঠিক নয়। যে-সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতরা ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা অনায়াসেই ধর্মকে law, custom, usage, morality, virtue, religion, duty, piety, justice এবং righteous conduct ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আর এসবগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে মর্ত্যজীবনের ভাব, অমর্ত্যের কোন চেতনা নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার নানাবিধ দিককে সংহত ও প্রত্যয়িত করা হয়েছিল একটি অলিখিত অনুশাসন দিয়ে যার নাম ধর্ম। বুদ্ধিতে ধরা দেয়, প্রতিনিয়ত বোধে উপস্থিত থাকে এইরকম একটি অনুশাসনের নাম ধর্ম। অন্যরকমভাবে বললে ধর্ম হল সেই নীতি বা সেই নিয়ম যা সমাজবদ্ধ মানুষের বোধবুদ্ধিকে আপ্লুত হতে দেয় না, তার কর্তব্য থেকে তাকে বিচ্যুত হতে দেয় না।

২৮। উল্লেখ্য, এই ধর্ম কোন বিশেষ মানুষের ধর্ম নয়। সর্বস্তরের মানুষের পালনীয় রীতিনীতিই হল ধর্ম। বর্ণ ও আশ্রম এই দুই বিভাগের ও তাদের প্রতেকটির অন্তর্বিভাগের বিভিন্নতার মধ্যে হিন্দুসমাজকে বেঁধে রাখতে হলে শুধুমাত্র কতগুলি লিখিত সামাজিক আইনই যথেষ্ট ছিল না। বর্ণ ও আশ্রমের যেমন সরল বিন্যাস ছিল, তেমন ছিল তাদের ব্যতিক্রম (যেমন বর্ণের ক্ষেত্রে প্রতিলোম ও অনুলোম)। যারা এ-সবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যারা ছিলেন না, অর্থাৎ হিন্দুসমাজবৃত্তের অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে যারা বাস করতেন তারা এত অসংখ্য, এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র যে তাদের লিখিত কয়েকটি সামাজিক আইনের মধ্যে বেঁধে রাখা যেত না। তাই যুগযুগান্তর ধরে কিছু রীতি-নীতিকে গড়ে তোলা হয়েছে। তার সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে কিছু বোধকে, কিছু ধারণাকে, কিছু বিশ্বাসকে,

১৭. Dr. H. N. Sinha, *Sovereignty in Ancient Indian Polity*, pp. 27-30, 326.

কিছু নৈতিকতা আর বিবেককে। ধর্ম তাই বহুর দ্যোতক, অনেক কিছুর আধার। সমাজজীবনে সদাচার আর সুকৃতির আরেক নাম ধর্ম।[১৮]

২৯। সমাজজীবনে সদাচার আর সুকৃতি না থাকলে জীবের পালন ও রক্ষণ হয় না। মহাভারতের কর্ণপর্বে জীবের পালন ও রক্ষণকেই ধর্ম বলা হয়েছে : 'অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম'[১৯]—এটি কৃষ্ণোক্তি।[২০] ভারতীয় রাজাদের এই ধর্মপালনই ছিল শাস্ত্রোক্ত বিধি। ১৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দের জুনাগড় অনুশাসনে (Inscription) বলা হয়েছে যে মহাক্ষাত্রপ রুদ্রদামন ছিলেন এমন একজন রাজা, 'যিনি তাঁর দক্ষিণ হাত (বরাভয়ের ভঙ্গিতে) উর্ধ্বে তুলে গভীরভাবে ধর্মযুক্ত হয়েছিলেন' ('One who by the raising of his right hand has earned the strong attachment of *Dharma*')। অধ্যাপক কীলহর্ণ-এর মতে রাজার দক্ষিণ হাত উর্ধ্বে তোলার চিত্রটি মনু-নির্দিষ্ট বিধির দ্যোতক। মনু বলেছেন বিচারের সময় রাজা তার দক্ষিণ হাত উর্ধ্বে তুলে রাখবেন ('পাণিমুদ্যমস্য দক্ষিণম্')। জুনাগড় শাসনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে মহাক্ষাত্রপ রুদ্রদামন পুরবাসীদের কর, 'বিষ্টি' বা জবরশ্রম (forced labour) ইত্যাদির দ্বারা উৎপীড়ন করতেন না। রাজার ধর্মপালনের এই ছিল ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি। দক্ষিণ ভারতের কদম্ববংশীয় রাজা শিব (স্কন্দ) কে মলবল্লী (Malavalli) স্তম্ভানুশাসনে 'ধর্ম-মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এই একই বংশের রাজা মৃগেশবর্মন্‌কে হিৎনাহেববাগিলু (Hitnahebbagilu) তাম্রশাসনে, তাঁর অনুজ মান্ধাতৃবর্মন্‌কে কুদাগেরি (Kudagere) তাম্রশাসনে এবং মৃগেশবর্মন্-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র রবিবর্মন্‌কে নীলাম্বুর (Nilambur) তাম্রশাসনে 'ধর্মমহারাজ' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণভারতের গঙ্গ বংশের রাজা মাধববর্মন্‌কে নোণামঙ্গল তাম্রশাসনে 'ধর্মমহারাজাধিরাজ' উপাধি দেওয়া হয়েছে। 'মহারাজ', 'অধিরাজ' ইত্যাদি উপাধিগুলি ছিল পরাক্রম ও ক্ষমতার দ্যোতক। এগুলির সঙ্গে 'ধর্ম' কথাটি যোগ করে ধর্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে প্রজাপালনের দিকটিকে চিহ্নিত করা হত। রাজারা মাতার মতো প্রজাপালক, কদম্বদের সম্বন্ধে এইরূপ একটি

১৮. 'These considerations would justify our assumption that the *dharmasastras formed* essentially a universal code of righteous conduct for all castes and classes'—Saletore. অধ্যাপক আয়েঙ্গারও এই মত স্বীকার করেছেন : 'Rules of law and conduct on the other hand, like those contained in a *Dharmasutra*, are of inteest to all *classes* of men equally.'

১৯. 'ধর্মতত্ত্ব', ক্রোড়পত্র-খ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২০. 'যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি'—ঐ

ধারণার উল্লেখ আছে রবিবর্মন্-এর নীলাম্বুর তাম্রশাসনে। সদাচার ও সুকৃতি রাজকীয় ধর্মের অঙ্গ ছিল।

৩০। সদাচার আর সুকৃতি না থাকলে সমাজকে ধারণ করা যায় না। তাই ধর্ম বলতে প্রাচীন হিন্দুরা অনাসক্ত উপাসনাকে বোঝাত না। আসক্ত ঐহিক জীবনচর্যার কতগুলি পালনীয় নীতিই ছিল ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত অর্থ বন্ধন, তাই ধর্ম হল সমাজবন্ধনী।[২১] ধর্ম একাধারে নীতি ও অভ্যাস, সাধনা ও চর্চা, কর্ম ও দর্শন। প্রাজ্ঞের উপদেশ, সমাজের আদেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন এই সবকিছুর মধ্য থেকে ধর্ম তার রূপটিকে খুঁজে নিত। এই ধর্ম শুধু আরাধনার বিষয় ছিল না। এটি ছিল অনুশীলনেরও বিষয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব'কে 'অনুশীলন' বলে বর্ণনা করেছেন। ধর্মের এই সামাজিক রূপটি বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে religion[২২] শব্দের সঙ্গে ধর্ম কথার মিল থাকলেও religion শব্দের আধুনিক ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্ম কথার কোনও সঙ্গতি নেই।[২৩] এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতটি অনুধাবনযোগ্য : 'For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life ; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual World are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its opponent parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its

২১. ধর্ম্ম (ধর্ম্ম) কথার ব্যুৎপত্তি হল ধৃ + মন্ ('ধ্রিয়তে লোকোহনেন ধরতি লোকং বা')। যার দ্বারা লোক বা সমাজসংসার ধৃত হয় তা হল ধর্ম।

২২. প্রচলিত মত হল religion শব্দটি 're-ligare' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর প্রকৃত অর্থ বন্ধন। এই অর্থে ধর্ম সমাজবন্ধনী। রোমান পণ্ডিত সিসেরো বলেন 're-ligare' শব্দটির অর্থ হল 'পুনরাহরণ, সংগ্রহ চিন্তা, এইরূপ'। ম্যাক্সমূলার এই মতকে সমর্থন করেন। এই দুটি মতই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' উল্লেখ করেছেন।

২৩. '...এ [re-ligare] শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।' '....ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ ..... এই জন্য আমি ধর্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি'—বঙ্কিমচন্দ্র, 'ধর্মতত্ত্ব'।

existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity'.[২৪]

৩১। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'one compact and harmonions whole', ধর্ম ছিল তা-ই। মানুষের সমস্ত জীবন ব্যেপে ধর্ম গড়ে উঠেছিল। তাকে বাদ দিয়ে প্রাচীন হিন্দুরা জীবন কল্পনা করতে পারত না। জীবনের কোন কোন নীতি ধর্মের অনুষঙ্গরূপে গড়ে উঠেছিল তার কয়েকটি নীচের উদ্ধৃতি[২৫] থেকে বোঝা যাবে।

1. That ***Dharma***, which exists without harm to creatures, is approved by the good.
2. Non-injury to all creatures is considered to be the foremost duty. This is the highest and best characteristic of ***dharma*** not causing suffering to others.
3. Sacrifice, charity, kindness to creatures, ***brahmacarya***, truthfulness, compassion, fortitude, forgiveness—these (constitute) great *dharma;* this is the eternal source of the eternal ***dharma***.
4. O you possessed of true valour, that *dharma* which conflicts with a ***dharma*** is not a *dharma* (in the real sense of the term); that is bad ***dharma.*** That is ***dharma*** which is unconflicting.
5. The wise have stated the single ***dharma*** to have four quarters.
6. What is said in the Veda is the highest ***dharma,*** another is contained is Smrti, yet another is stated to be what is practised by the wise—these three are the eternal ***dharmas.***
7. The highest dharma is stated in the veda, another (*dharma*) is in Dharmasastras, the one practised by the wise–threefold is the characteristic of ***dharma,*** according to the wise.

৩২। উপরের উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে অনায়াসে ধর্মের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যায়, যেমন, 'without harm to creatures' বা 'non-injury to all creatures, sacrifice, charity, kindness to creatures, truthfulness, compassion, fortitude, forgiveness' ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় কয়েকটি নীতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলের জন্য এই রকম নীতি রচিত হয়েছিল। যেমন,

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম্মতত্ত্ব।

২৫. Dr. S. Banerji : *Indian Society In the Mahabharata* (*Based on Smriti Material In The Mahabharata*), Bharata Manisha, Varanasi, 1976, p. 96 [Ch. XXI entitled Dharma].

For the twice-born *dharma,* which is one and is of one colour, is nectar. Sacrifice, (Vedic) study and gifts—these three are known to be common (to all the twice-born, i.e. Brahmana, Ksatriya and Vaisya).

There is no difference among casts; all this world belongs to Brahman. What was formerly created by God has turned into caste by deeds.[২৬]

৩৩। কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে বর্ণ নির্ধারিত হয়, শাস্ত্রের এই হল বিধান। ধর্ম প্রতিফলিত হয় কৃতকর্মে, আর ধর্ম হল 'অমৃত'। 'দ্বিজানামমৃতং ধর্ম্ম' কিংবা, 'দ্বিজাতিনাং ঋতং ধর্ম্ম' ('ঋতং সত্যমাত্মজ্ঞানাখ্যম্'—নীলকণ্ঠ)। ঋত বা সত্যই হল ধর্ম। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর'—সত্য কথা বল, ধর্মাচরণ কর, কিংবা 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্'—সত্য থেকে বিরত হয়ো না, ধর্ম থেকে বিরত হয়ো না, এই ধর্ম যে কি তা স্পষ্ট করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। টীকাকারের মন্তব্য :

Contentment with one's own wife, purity, constant freedom from jealousy, self-knowledge and fortitude are, O king, the common ***dharmas.***[২৭]

অথবা,

Observance of ***dharma,*** truthfulness, self-control, penance, freedom from malice, sense of shame, fortitude, absence of jealousy, performance of sacrifice, gifts, patience, learning—these twelve are the great vows of a Brahmana.[২৮]

অথবা,

Absence of attachment, pride, hope, evenness of attitude to all, not to be afflicted with passion—these constitute the eternal ***dharma*** of the honest.[২৯]

অথবা,

From the beginning the duty of a Ksatriya is known to be the protection of the people. A king, enjoying the fruit as fixed, is associated with ***dharma.***[৩০]

২৬. ওই, পৃঃ ৩
২৭. ওই, পৃঃ ৫
২৮. ওই পৃঃ ১১
২৯. ওই পৃঃ ১২
৩০. ওই পৃঃ ২১

৩৪। মহাভারত নিয়ে গবেষণার ফলশ্রুতির কিছুটা উপরে উদ্ধৃত হল। অধর্মের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় কখনও স্থায়ী ঘটনা হতে পারে না, এ কথা মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে। যুধিষ্ঠির একবার ঋষিদের প্রশ্ন করেছিলেন :

'....তথাপি তাহারা (অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা) এই পৃথিবীমণ্ডলে অভ্যুদয়-লাভ করিতেছে, ইহার কারণ কি?' ঋষি লোমশ এর উত্তরে বললেন : 'মহারাজ! অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখসম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু[৩১] বোধ করিয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেক দৈত্য ও দানব অধর্ম্মাচরণ দ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।'[৩২]

অধর্মের মধ্য দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্তিই হল দণ্ডভোগ। এইখানেই ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের যোগ সূচিত হয়েছে।

৩৫। উপরের আলোচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ছিল প্রাত্যহিক আচরণের বিষয়, অতিলৌকিক সাধনা নয়। মৌর্য সম্রাট অশোক এ-কথাটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মের একটি বড় অংশ হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ। এই উপদেশাবলীই হল তার 'পোরানা পকিতি' (ancient rule) :

> Obedience must be rendered to mother and father, likewise to elders, firmness (of compassion) must be shown towards animals; truth must be spoken : these same moral virtues must be practised.
>
> In the same way the pupil must show reverence to the master, and one must behave in a suitable manner towards relatives.[৩৩]

৩৬। অশোকের উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের বাণী : 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব' ইত্যাদি—মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর, পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর, শিক্ষককে দেবতা জ্ঞান কর। এই সমস্ত উপদেশকে প্রতিপালন করার নির্দেশও

৩১. নিজেকে প্রভু বোধ করার বিড়ম্বনা পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও বুঝতে পেরেছিলেন। ফরাসি দার্শনিক রুশো লিখেছেন : 'One who believes himself the master of the rest is only more of a slave than they' (Social Contract, I).

৩২. কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃ. ১০৪।

৩৩. *An Advanced History of India* by Majumdar, Raychaudhuri and Datta, MacMillan Student Editions, p. 100

উপনিষদে বলা হয়েছে : 'এষঃ আদেশঃ, এষঃ উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ, এতদনুশাসনম্'—এইটি আদেশ, এটি উপদেশ, এইটি বেদ ও উপনিষদের মূল কথা, এইটিই হল অনুশাসন। অশোক তাঁর উপদেশাবলীকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তাদের বলা হত ধর্মমহাপাত্র। এই কর্মচারীরা প্রত্যেক মানুষের জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন।[৩৪] জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজুক নামে আরেক শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হত।[৩৫] এই কর্মচারীরা সম্মিলিতভাবে যা প্রচার করতেন, তা কোন ধর্ম নয়, তা হল একটি বোধ, একটি বিবেক, একটি সুনির্দিষ্ট জীবনচর্যার বিধি।

> The emperor was urged on by an anxious desire to uplift the morality of the people, by bringing home to them the essential features of his ***dharma.*** So he engraved these on imperishable stones, which even to-day, after the lapse of more than two thousands years, stand as an undying monument to his purity of life and sublimity of thoughts. The aspect of ***dharma*** which he emphasised was a code of morality, rather than a system of religion. He never discussed metaphysical doctrines, nor referred to God or soul, but simply asked the people to have control over their passions, to cultivate purity of life and character in inmost thoughts, to be tolerant to other's religion, to abstain from killing or injuring animals and to have regard for them, to be charitable to all, to behave with decorum to parents, teachers, relatives, friends, and ascetics, to treat slaves and servants kindly, and above all, to tell the truth.[৩৬]

৩৪. 'Accordingly, new officials, styled *Dharma-Mahamatras* or high officers in charge of religion, were appointed. They were employed in the imperial capital as well as in the outlying town and tribal territories, especially on the western and north-western border of the empire. They busied themselves with the affairs of all sects and of the people in various walks of life, including princes and princesses of the blood as well as prisoners in jail, ordinary householders and their servants as well as homeless ascetics'—*An Advanced History of India*, Majumdar, Raychaudhuri and Datta, MacMillan, 1967, p. 79.

৩৫. 'The moral uplift and the welfare of the country folk were specially entrusted to functionaries styled *Rajukas* who had imperial agents to guide them' –*ibid.* p. 98.

৩৬. Ancient India by R.C. Majumdar, Motilal Banarsidass, 7th edn, 1974, p.112.

৩৭। প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারে অশোকের অধ্যাত্মবোধ নিশ্চয় কাজ করেছিল। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কাজ করেছিল জনসাধারণের নৈতিক জীবনসমস্যার সুচারু নিষ্পত্তির সদিচ্ছা। সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবন, তার মান ও সৌষ্ঠব, সবযুগে এক থাকে না। কিন্তু তার ভারসাম্যের এক ন্যূন তল বজায় রাখতে হয়। সেইদিকে যদি রাষ্ট্রের দৃষ্টি না থাকে তবে সে রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র দুর্বল হতে বাধ্য। প্রাচীনকাল থেকে তাই ভারতীয় সমাজে এই নীতিবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চলেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট করে 'সুকৃতি' ও 'দুষ্কৃতি'র কথা বলা আছে। প্রাচীন ভারত কর্মফলে[৩৭] বিশ্বাস করত। সুকৃতির ফল পুণ্য, দুষ্কৃতির ফল পাপ। সুকৃতির থেকে আসে জ্ঞান, আর জ্ঞান থেকে মুক্তি বা নির্বাণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মানুষের আত্মাকে 'সবিজ্ঞান' বলা হয়েছে। 'সবিজ্ঞান' কথার অর্থ হল সচেতন বা জ্ঞানময়। বিদ্যা, কর্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞা বা অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আত্মা সচেতন হয়।[৩৮]

৩৮। অতএব বিদ্যা ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুকর্ম বা সুকৃতি মানুষকে ঐহিক জীবনের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করে। ধর্ম হল এই সুকৃতির বোধ, আচরণীয় ব্যবহারের নিয়ম ও শৃঙ্খলা। এই বোধ দিয়েই ধর্ম সমাজকে ধারণ করত এবং সমাজধারণে ধর্মের বিশিষ্টতা এইভাবেই চিহ্নিত হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই প্রাচীনকালে ধর্মের সঙ্গে কর্মবাদকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দুষ্কৃতির পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছিল বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব। ধর্মতত্ত্ব, কর্মবাদ ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, এই তিনটি ছিল প্রাচীন ভারতে সমাজসংগঠনের মৌলিক দর্শন ও বুনিয়াদ। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিন তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝতে না পারার ফলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অতিলৌকিক ভাবময় দিকটি আমাদের চোখে বড় বেশি করে ধরা পড়ে, আর আমরা ভুলে যাই যে সে যুগের মানুষও আমাদের মতো বস্তুর ঘনীভূত পরিমণ্ডলে তাদের জৈবিক অস্তিত্ব নিয়ে বাস করত, যেখানে শোষণ-শাসনের রুদ্রপ্রভাবে জীবনের নৈতিক ধারাটি শুকিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এ পরিবেশে ধর্ম মানুষকে দিয়েছিল বিবেক, কর্ম প্রয়াস আর প্রায়শ্চিত্ত তপস্যা। প্রাচীন ভারতে তাই ধর্ম কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কর্ম প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সংযত। এই তিনটি সম্মিলিত ভাবে অর্থবহ, একটির অনুপস্থিতিতে অন্য দুটি ম্লান।

৩৭. *প্রাচীন ভারতের কর্মবাদ নিয়ে একটি ভালো গবেষণাগ্রন্থ হল The Theory of Karman in Indian Thought* by Koshelya Walli, Bharata Manisha, Varanasi, 1977.

৩৮. 'তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ'—বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২.

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মতত্ত্ব

৩৯। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মানুষ একটি কর্মদর্শনের উপর নিজের জীবনকে স্থাপন করে এসেছে। এই কর্মদর্শন কখনো তার অধ্যাত্ম, কখনো বা তার সমাজদর্শনের অংশরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্মের সঙ্গে ধর্ম সংযুক্ত, আর ধর্ম ও কর্ম উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায়শ্চিত্তবোধ। কর্মের সঙ্গে কার্য-করণ সম্পর্কে বাঁধা হয়ে আছে জন্মান্তরের ধারণা। এমনকি স্বর্গ-নরকের ধারণাও কর্মের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন ভারতে রাজার রাজ্যশাসন থেকে প্রজার প্রাত্যহিক আচরণ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম-কর্ম-প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে এই ত্রি-সূত্রের কোনটিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জীবন কল্পনা করা যেত না।

৪০। ধর্ম-কর্ম-প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই অল্পবিস্তর সজাগ—আগেও ছিল, এখনও আছে। দোষ-গুণের ধারণা, সত্য-অসত্যের ধারণা, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, নৈতিক-অনৈতিকের ধারণা, উচিত-অনুচিতের ধারণা, স্বস্তি-অস্বস্তির ধারণা, শান্তি-অশান্তির ধারণা এবং সর্বোপরি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদির ধারণা যে-সমাজে স্বীকৃত সেই সমাজেই কোন না কোনভাবে ধর্ম-কর্ম-প্রায়শ্চিত্তের ধারণাও স্বীকৃত। খ্রিস্টধর্ম যে, charity, chastity, clemency, কিংবা doom, retribution, resurrection ইত্যাদির কথা বলে তা আসলে একাধারে পার্থিব ধর্ম-কর্ম ও অপার্থিব প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এ-ধরনের কর্মতত্ত্ব ও অপার্থিব প্রায়শ্চিত্তের কথা প্রাচীন গ্রিসদেশেও স্বীকৃত ছিল—অন্তত গ্রিকনিয়তিবাদের মধ্যে তা নিহিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা কর্মের নিয়ম, কর্মের শাসন, কর্মের শৃঙ্খলা, কৃতকর্ম ও ফলভোগের পরম্পরা ইত্যাদির মানবিক ও নৈসর্গিক দিকগুলিকে একটি সুচারু শৃঙ্খলার মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিল। এই শৃঙ্খলাই হল ভারতীয় কর্মবাদ।

৪১। স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখিয়ে ইহজীবনে মানুষকে সুকর্মে সুস্থিত ও সচল রাখাটাই যে কর্মবাদের মূল উদ্দেশ্য তা নয়। কারণ এ-বিষয়ে কর্মবাদের থেকেও অনেক বড় হাতিয়ার ভারতীয় সমাজের হাতে ছিল, তা হল দণ্ডনীতি। কর্মবাদ তাই কোন

উদ্দেশ্যসাধনের সরল হাতিয়ার নয়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধানই ছিল কর্মবাদের মূল কথা। জীবের বিধি ও নিসর্গের বিধানকে সমান্তরাল না ভেবে, সংশ্লিষ্ট ভাববার যে প্রয়াস তার থেকেই ভারতীয় কর্মবাদের জন্ম। এ-প্রসঙ্গে একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> The law of Karma, as understood in India, does not mean simply that merit is rewarded in heaven and demerit punished in hell. In other words the Karmic law which means to an Indian mind the principle of justification in Nature is really the law of action and reaction implying that every action under specific circumstances has its corresponding reaction which is exactly proportionate to it. It is for this reason that we are constrained to regard it as the principle of Nature's self-adjustment–(Koshely a Walli : *The Theory of Karman in Indian Thought.*)

৪২। ভারতীয় চেতনায় কর্ম হল এক অদৃশ্য শক্তি যা এক জন্মের ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত, অন্য জন্মের অস্তিত্বের উপর প্রভাবশীল। অর্থাৎ ক্রিয়ার জন্মান্তর পরিণামের তত্ত্বই হল কর্মতত্ত্ব। আত্মার দেহধারণ জন্মান্তরের কৃতকর্মের ফল। অজ্ঞাতজনিত কর্মবৈকল্য আনে বৈগুণ্য আর তার ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। এক জন্মে এই ভোগ শেষ না হলে আত্মাকে অপেক্ষা করতে হয় অপর জন্মে দেহধারণের জন্য। এইভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে কর্ম প্রবাহিত হয়। কর্মফল অতিলৌকিক। কর্মকবলিত জীবনধারা বিগত থেকে অনাগতের দিকে ধাবিত। এর শুরু সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শন নীরব। ধরে নেওয়া হয় যে ঐহিক জীবনের কোন একটি নিরালোক পটভূমিকা আছে যেখানে মানবিক অজ্ঞতার তমিস্রতম পরিণাম ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে এক অদৃশ্য শক্তি রচনা করে আর এই শক্তিই নিয়তির রূপ ধরে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হিন্দু দর্শন অনুযায়ী কর্মপ্রভাব থেকে মানুষের নিষ্কৃতিই হল প্রকৃত মুক্তি। এই মুক্তি আনন্দ থেকে মুক্তি, বেদনা থেকে মুক্তি, কারণ আনন্দ-বেদনা হল কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পরিণতির ভাব মাত্র।

৪৩। উপরে কর্মের যে আলোচনা করা হয়েছে তা প্রধানত ব্যষ্টির বা ব্যষ্টিজীবের কর্ম। অনুরূপভাবে সমষ্টিজীবের কর্মের কথাও শাস্ত্রে বলা আছে। এটি হল সমাজ বা কোন একটি যুগের কর্ম। প্রত্যেক মানুষের নৈতিক জীবনের মতো প্রত্যেক সমাজেরও একটা নৈতিক জীবন আছে। আর তার উপরে নির্ভর করে এক-একটি যুগের নৈতিক জীবন। এবিষয়ে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম-অষ্টম শ্লোক দুটি স্মরণীয় :

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

৪৪। যখন ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্মকারী মানুষের দমনের জন্য ঈশ্বর শরীর পরিগ্রহ করেন। এটিকে বলা যেতে পারে ভারতীয় কর্মবাদের ধর্মসংস্থাপন তত্ত্ব। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবতারবাদ। অর্থাৎ একটি যুগ তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পায় ঈশ্বরের হাতে। অবতারবাদের মতো আরেকটি তত্ত্ব হল প্রলয়ের তত্ত্ব। প্রলয়ে একটি যুগ, একটি দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছুই ভারতীয় কর্মতত্ত্বের রকমফের। সমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে কর্মকে দেখা হয়েছে।

৪৫। কর্ম হল পূর্বজন্মের ধর্ম ও অধর্ম। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর আচারস্মৃতিতে বলেছেন : 'পূর্বজন্মার্জিতৌ ধর্মাধর্মৌ নিয়তিঃ' অর্থাৎ পূর্বজন্মের ধর্মাধর্মই হল নিয়তি। সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার দুল্লনও এই একই কথাই বলেছেন। শাস্ত্রে ব্যবহৃত নিয়তির সমার্থক বা বিকল্প শব্দ হল 'বিধিলিপি', 'ললাটরেখা', 'বিধাতৃনির্দেশ' ইত্যাদি। এই সবগুলির দ্বারা বোঝায় কোন এক অদৃশ্য দৈব বা নৈসর্গিক শক্তি যা আমাদের ইচ্ছার বাইরে থেকে আমাদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে। এই শক্তি থাকে আমাদের গোচরের বাইরে, জ্ঞানের পরপারে। তা অদৃশ্য, অনিয়ন্ত্রিত, অপ্রতিরোধ্য। এই শক্তি অলক্ষ্যের বলে এর নাম 'অদৃষ্ট'। মোটের উপরে মানুষ এই শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। এই শক্তিই হল কর্ম।

৪৬। কর্মচক্রের তিনটি ভাগ : সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। বহুযুগের পুঞ্জীভূত কর্মের নাম সঞ্চিত কর্ম। সঞ্চিত কর্মের একটি অংশ মানবজন্ম ঘটায়। তার নাম প্রারব্ধ কর্ম। জন্মের পর দেহী মানুষ যে কর্ম করে তার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম। প্রারব্ধ ছাড়া আর সব কর্মই জ্ঞানের অনলে ভস্মীভূত হয়।[৩৯] তাই শাস্ত্রে 'জ্ঞানাগ্নি' কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া আত্মা দেহধারণ করতে পারে না। দেহধারণ করতে না পারলে জন্ম হয় না। জন্ম না হলে কর্মের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। তাই সহজে প্রারব্ধ কর্ম থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই।

৪৭। বশিষ্ঠ-সংহিতায় কর্মকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : প্রবর্তক কর্ম ও নিবর্তক কর্ম। প্রবর্তক কর্মের পশ্চাতে আছে বাসনা ও ইচ্ছা। বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষ প্রতিটি পর্যায়ে কিছু বাসনা করে, কিছু ইচ্ছা করে। এই বাসনা ও ইচ্ছাই মানুষকে বর্ণাশ্রমে নিযুক্ত রাখে। অর্থাৎ মানুষের ঐহিক জীবনের সমস্ত সূচনার মূলে যে কর্ম,

৩৯. গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে জ্ঞান সকল কর্মকে ভস্মীভূত করতে পারে : 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'। অবশ্য নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় এর অনুবাদ করেছেন এই রকম : '(দেখ যেমন প্রদীপ্ত অনল কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে) জ্ঞানানল সেই প্রকার প্রারব্ধকর্ম ভিন্ন সকল কর্মকে নিঃশেষে ক্ষয় করে।' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, দি নিউ বুক স্টল, ১৩৫৭, কলকাতা, পৃ. ১৪৪।

তা-ই হল প্রবর্তক কর্ম। এই কর্ম বর্ণাশ্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টার অন্তরালের পরিচালিকা শক্তি হল এই কর্ম। তাই এর নাম প্রবর্তক কর্ম।

৪৮। প্রবর্তক কর্মের সঙ্গে যখন জ্ঞান যুক্ত হয় তখন মানুষের আসক্তি নিবৃত হয়। মানুষ তখন পরিচালিত হয় নিবর্তক কর্মের দ্বারা। নিবর্তক কর্মের মূল কথা হল জ্ঞানজনিত আসক্তি থেকে নিবৃত্তি। নিবর্তক কর্ম মানুষের ঐহিক মুক্তির দ্যোতক। জন্ম-মৃত্যুর বিরামহীন চক্র থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় নিবর্তক কর্ম। নিবর্তক কর্মের মূল কথা হল জ্ঞান। এবং জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী জ্ঞান ও কর্ম একে অন্যের বিপরীত। কর্ম আনে বন্ধন, জ্ঞান আনে মুক্তি। কর্ম মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে টেনে আনে, জ্ঞান তার থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শাস্ত্রের কথাকে স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায় এই : যখন কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা যায়, অর্থাৎ যখন আমরা ফলপ্রাপ্তির আশা নিয়ে কাজ করি, তখন আমরা প্রবর্তক কর্মচক্র দ্বারা আবর্তিত হই। যখন আমরা কোন ফলপ্রাপ্তির আশা করি না, তখন নিবর্তক কর্ম আমাদের আশ্রয় করে, আমরা মুক্তিলাভ করি। বশিষ্ঠ-সংহিতার নিবর্তক কর্ম আর গীতার নিষ্কাম কর্ম একেবারেই সমার্থক।

৪৯। প্রবর্তক ও নিবর্তক কর্মকে বর্তমান টীকাকাররা এইভাবে দেখেছেন : প্রবর্তক কর্ম হল বাহ্যিক ক্রিয়া, শাস্ত্রে কথিত যাবতীয় ঐহিক কার্যবিধির যথাযথ প্রতিপালন। নিবর্তক কর্ম হল আভ্যন্তর কর্ম, অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া যা আত্মার নিজস্ব চেতনার মধ্য অনুষ্ঠিত।[৪০] প্রারব্ধ কর্ম হল নিত্যকর্ম, শ্রুতি ও স্মৃতির অনুসরণ এবং যাবতীয় অনুশাসনের প্রতিপালন। এটি প্রাত্যহিক ও বাহ্যিক। বশিষ্ঠ বলেছেন যে যাবতীয় দৈহিক কর্মসাধনা থেকে মানসিক কর্মসাধনা বড়ো। আর এই সাধনাই মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। তাই তিনি জ্ঞানকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ মুক্তির জন্য কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হওয়া দরকার। ঈশোপনিষদে এই জ্ঞানকে বলা হয়েছে বিদ্যা, আর কর্মকে বলা হয়েছে অবিদ্যা। আরও বলা হয়েছে যে জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত সমান্তরাল। কেনোপনিষদেও জ্ঞানকে তপস্যার সঙ্গে যুক্ত থাকতে বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে গৃহস্থের সংসার হল ব্রহ্মলোক অর্জনের মাধ্যম। অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম ও জ্ঞানজনিত মুক্তি উভয়ের কথাই একসঙ্গে বলা হয়েছে। হারীত সংহিতায় বলা হয়েছে যে পাখি যেমন তার দুটি পাখার উপর ভর করে আকাশে ওড়ে, ঠিক সেই রকম জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের উপর নির্ভর করে মানুষকে মোক্ষর দিকে অগ্রসর

৪০. 'Vasistha points out that the external karma is of the nature of kriya and it is no other than the performance of what is enjoined in the Sastras. The inner Karma which is called Nivartaka is done by means of the mind and or buddhi and is done within the Atma itself' –Koshelya Walli.

হতে হবে। জ্ঞান ও কর্ম যুক্ত না হলে ব্রহ্মলাভ ঘটে না। মহাভারতের শান্তিপর্বে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে জ্ঞান ও কর্ম যুক্ত না হলে মানুষের মুক্তি নেই। আত্মার পূর্ণতা সাধনের জন্য জ্ঞান ও কর্মের অন্বয়ের কথা বৃহৎযাজ্ঞবল্ক্যতেও বলা হয়েছে। মেধাতিথি, ভাস্করাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষুও এই মত সমর্থন করেছেন এবং শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে এই মতের প্রতিধ্বনি করেছেন। আসলে এটি হল বেদান্তের সনাতন মত। তবে এই মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন বশিষ্ঠ।[৪১] তিনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে যোগের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানের[৪২] অন্বয়কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

৫০। ভারতীয় কর্মবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে স্বর্গ ও নরকের ধারণা। স্বর্গের কথা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে উল্লিখিত আছে। এই বিষয়ে ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব বেদের কথা বিশেষভাবে বলা যায়। পরবর্তী সংস্কৃত গ্রন্থেও স্বর্গ ও নরকের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে স্বর্গে কোন দুঃখ নেই কিন্তু সুখ যা আছে তা চিরকালের নয়। স্বর্গে বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আবাসের কথা আমরা শুনে থাকি। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে যে স্বর্গ হল আনন্দের স্থান কারণ সেখানে বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে। বাসনার সুখ-সমাপনের জীবনই হল স্বর্গ। স্বর্গলাভের উপায় হল দান ও উপাসনা। এটি হল ঋগ্‌বেদের মত। অবশ্য যজ্ঞ ও প্রায়শ্চিত্তকেও ঋগ্‌বেদে স্বর্গলাভের পথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে স্বর্গজীবনে তৃপ্তি আছে, মৃত্যু নেই; ভোগ আছে জরা নেই; আনন্দ আছে ক্ষয় নেই। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা স্বর্গের যে বর্ণনা পাই তা স্বপ্নঘন মনোরম আতিশয্যেব ছবি। সেখানে তমিস্রা নেই, কারণ সূর্য সেখানে অস্ত যায় না; সেখানে সুধা ঝর্ণা হয়ে ঝরে; সেখানে জলের মর্মর পাখির গান, বাতাসের ধ্বনি, সমস্ত কিছুই বাঁশির সুরে বাজতে থাকে। স্বর্গের উদ্যান, সুন্দরী রমণী, সুগন্ধ ফুল, মনোরম লতা, সুমিষ্ট ফল, দুধ-ঘি-মধুর সরোবর এ-সমস্ত কিছুই অথর্ব বেদে উল্লিখিত আছে।[৪৩] এরকম যে মধুর স্থান সেখানে নাকি অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বর্গ কি কোন স্থান, না অন্য কিছু? জৈমিনি সূত্রের উপর টীকা দিতে গিয়ে শবর বলেছেন যে স্বর্গ

৪১. যতঃ কর্মৈব কুর্বন্তি জ্ঞানিনোহপি মুমুক্ষবঃ।
ততস্তমপি বিপ্রেন্দ্র জ্ঞানেনাচার কর্ম তৎ।।—বশিষ্ঠ সংহিতা (এক/২৭)

৪২. জ্ঞানং যোগাত্মাকং বিদ্ধি, যোগস্তু আত্মনি তিষ্ঠতি।

৪৩. 'According to the Atharvaveda, it is stated that in the heavenly world the bevies of women are the denizens of heaven. People get many edible plants and flowers. There are ponds of ghee, streams of milk and honey. Wine flows like water and lotus lakes surround the denizens. The meritorious alone are entitled to enjoy the delights of the heaven, free from disease Whatsoever' —Koshelya Walli, *The Theory of Karman in Indian Thought, p.* 40.

বলতে বস্তু, মানুষ, স্থান সবকিছুকে বোঝায়। সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র, চন্দন, ষোড়শী কুমারী, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, ক্ষুৎপিপাসার লোপ, বেদনা ও ক্লান্তির উপশম এসবই হচ্ছে স্বর্গের দ্যোতক। পরে অবশ্য শবর তাঁর নিজের মতের সংশোধন করে বলেছিলেন যে স্বর্গ হচ্ছে আনন্দ ও আতিশয্যের অবস্থা, যে বস্তু, যে মানুষ বা যে স্থান থেকে আনন্দের সূচনা হয় তা নয়।

৫১। স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নরকের ধারণা। ঋগ্‌বেদে নরক কথাটির কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। যেমন ইন্দ্র ও সোমকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন দুষ্কৃতকারীকে অতল অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখে। এই রকম অতল অন্ধকার নরকের দ্যোতক বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। 'নরকলোক'-এর কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অথর্ব বেদে। দুষ্কৃতকারীর নরকবাস ও সেখানে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নেবার কথা শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে চারটি নরক আছে। সেগুলি হল যথাক্রমে বিসর্পিন্, অবিসর্পিন্, বিষাদ্দিন এবং অবিষাদিন্। বিভিন্ন স্মৃতিতে অসংখ্য নরকের নাম পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যেসব নরকের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি হল অসিপত্রবন, অন্ধতামিস্র, কালসূত্র, তামিস্র, তপন, পঙ্ক, মহানরক, রৌরব, মহারৌরব, প্রতিমূর্তক, মহাবীচি, লোহদ্বারক, লোহশঙ্কু, শল্মলী, সংহত, সংপ্রতাপন, অবীচি, সংঘাত, সবিষ, মহাপথ, কুম্ভীপাক ইত্যাদি।

৫২। প্রাচীন ভারত একথা বিশ্বাস করত যে স্বর্গপ্রাপ্তি বা নরকভোগ কর্মফলের উপর নির্ভর করত। ঋষি গৌতম বলেছেন যে সত্যবচনের ফল হল স্বর্গ, মিথ্যা বলার ফল হল নরক : 'স্বর্গঃ সত্যবচনে বিপর্যয়ে নরকঃ'। এখানে উল্লেখযোগ্য স্বর্গপ্রাপ্তি বা নরকভোগ কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। কর্মের পরিমাপ অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকবাসের সীমা রয়েছে। পাপ ও পুণ্যের পরিমাপ অনুযায়ী যখন স্বর্গ বা নরকবাসের অর্থাৎ অখণ্ড সুখপ্রাপ্তি ও যন্ত্রণা ভোগের কালসীমা পার হয়ে যায় তখন আরেকরকম কর্ম অবশিষ্ট থাকে। এই কর্মকে বলা হয় 'শেষ কর্ম'। 'শেষ কর্ম' হল সেই কর্ম যার দ্বারা পরলোকের পর আবার মানুষকে ফিরে আসতে হয় ইহলোকে, বিদেহী আত্মা দেহরূপ ধরে মর্ত্যলোকের জাতক হয়। 'শেষ কর্ম' হল ভারতীয় পুনর্জন্মবাদের অন্যতম বনিয়াদ।

চতুর্থ অধ্যায়

দণ্ডনীতি

৫৩। প্রাচীন ভারতে 'দণ্ড' শব্দটি গভীর ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় শাস্ত্রে তার ব্যবহার এত বিচিত্র যে আজ আমাদের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। গার্হস্থ্য জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দণ্ডের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যবহার এবং সে ব্যবহার যাতে ব্যর্থ না হয় এবং তা যাতে অকারণ, অন্যায় অত্যাচারে পর্যবসিত না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভারতীয় শাস্ত্রে বলা আছে। দণ্ডনীতিকে শাস্ত্রকাররা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছেন এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যাতে তার প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ না হয়। ফলে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি-শাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এত বড় যে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা কঠিন।

দণ্ড কী?

৫৪। দণ্ড কী? দণ্ডনীতি শাস্ত্র কাকে বলে? এ-দুটি প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করলে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের বিশিষ্টতা ধরা পড়বে। দণ্ড আর যাইহোক শুধুমাত্র শাস্তি নয়। শাস্তি মানে সাজা, যেখানে বিশেষভাবে শাসন ও তজ্জনিত অনিষ্টের আশঙ্কা সেখানে। চুরির শাস্তি বেত্রাঘাত। অর্থাৎ চোর যদি চুরি করে তবে তাকে বেত দিয়ে প্রহার করলে তার চুরি করার ঘটনাটির বা সে অপরাধের বিহিত হল অর্থাৎ তার কৃত অন্যায়ের বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। তাহলে চোরকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ হল বিধিসম্মত শাসনের অনুষ্ঠান এবং প্রহারের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে তার উপর অনিষ্টের আরোপ। শুধু এইটুকু বললে কিন্তু দণ্ড কথার গুরুত্ব বোঝা যাবে না। দণ্ডের মধ্যে শাসন আছে আর আছে সেই শাসনের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন। মহাভারতের শান্তি পর্বের ৫৯ অধ্যায়ের ৭৮ নং শ্লোকটিতে একথা বলা হয়েছে :

দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকান্ অভিবর্ত্ততে॥

'যাহার প্রভাবে এই জগৎ পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইয়া থাকে তাহাকেই দণ্ড বলে। দণ্ডদ্বারা জগৎ পুরুষার্থে নীয়মান হয় বলিয়া ইহাকে দণ্ডনীতি বলে।'[৪৪] অথবা 'যে নীতির দ্বারা দণ্ড প্রণীত হইয়া থাকে তাহাকে দণ্ডনীতি বলে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দণ্ডের মধ্য দিয়ে সর্ববিধ ব্যবহার নিয়মিত হয়। অর্থাৎ সর্ববিধ ব্যবহার নিয়মিত হবার জন্য এক নিয়ত শাসনের নামই দণ্ড।

৫৫। এর থেকে আমরা পরের কথায় আসতে পারি। শাসন যদি থাকে তবে দুঃখও থাকে, ভয়ও থাকবে। তাই মনু দণ্ডকে শ্যামবর্ণ ও লোহিতাক্ষ বলেছেন। মনুর এ-কথার ভাষ্য দিয়েছেন মেধাতিথি। তার মতে মনু রূপকের মধ্যে বলতে চেয়েছেন যে দণ্ড হল দুই প্রকার, দুঃখপ্রদ ও ভয়প্রদ। দণ্ডের মধ্যে দুঃখ আছে তাই তা শ্যাম। তার মধ্যে ভয় আছে তাই তা লোহিতাক্ষ বা রক্তচক্ষু। দণ্ডের মধ্যে যে ভয় আছে তা ভগবান মনু সপ্তম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে বলেছেন :

> সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুলর্ভো হি শুচির্নরঃ।
> দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥

'সর্ব লোকই দণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, (কারণ) সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাব মানুষ পৃথিবীতে বিরল। দণ্ডের ভয়েই সমস্ত জগৎ ভোগের উপযুক্ত হয়।'

৫৬। মহাভারতের শান্তিপর্বের ১৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক থেকে ১৩ শ্লোক এবং ৩৩-৩৪ শ্লোকে দণ্ড সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা মোটামুটিভাবে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৮-২৫ শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে। মনুর যেকথা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তা আসলে অর্জুনের কথা, যে কথা অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন :

> শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ দণ্ড উদ্যত হইয়া যে রাষ্ট্রে বিচরণ করে সে রাষ্ট্রের প্রজা কখনও বিষাদগ্রস্ত হয় না যদি রাষ্ট্রের নেতা সম্যগ্‌দর্শী হন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক এই চতুর্বিধ মনুষ্যই দণ্ডভয়ে স্বীয় পথে অবস্থিত আছে। কেবল ইহলোকের ব্যবহার নহে পারলৌকিক ব্যবহারও দণ্ডভয়েই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্জুন বলিয়াছেন দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কেহ যজ্ঞ করিত না, দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কেহ দান করিত না, দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কোন পুরুষই মর্যাদায় স্থিত থাকিত না।[৪৫]

কিংবা,

> যাহারা অনার্য, নাস্তিক বেদনিন্দক তাহারাও দণ্ডদ্বারা নিপীড়িত হইয়াহ মর্যাদাপালন করিয়া থাকে। পশুপক্ষী পর্যন্তও দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব

৪৪. **প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি** : মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা পৃ. ৪

৪৫. যোগেন্দ্র বেদান্ততীর্থ : ভূমিকা পৃ. ৩

> মর্যাদাতে অবস্থিত আছে। কাক, কুকুর প্রভৃতি মাংসাহারী প্রাণী যদি দণ্ডভয়ে ভীত না থাকিত তবে পশু মনুষ্য প্রভৃতিকে ইহারাই গ্রাস করিত। যজ্ঞের চরু পুরোডাশ প্রভৃতি কাক কুকুর প্রভৃতি প্রাণীই আহার করিত, যদি তাহারা দণ্ডভয়ে ভীত না থাকিত। ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন করিত না, ধেনুকে দোহন করা যাইত না, কোন কন্যাই বিবাহিত হইত না যদি দণ্ড ইহাদিগকে পালন না করিত। (ঐ ভূমিকা পৃ. ৩-৪)

৫৭। এখানে দুঃখপ্রদ ও ভয়প্রদ দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এই দণ্ড দু'রকমভাবে কাজ করছে—এক, দণ্ড পাবার ভয়ে কেউ নিজের মর্যাদার বাইরে কাজ করছেন না, অর্থাৎ নাস্তিক বেদনিন্দা করছেন না, ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকছেন না, কিংবা কন্যারা বিবাহ না করে জীবনযাপন করছেন না। এর অন্যথা হয়তো এরা করতে পারতেন। কিন্তু দণ্ডের ভয়ে অন্যথা না করার সংযম এদের নিজমর্যাদায় সুস্থির রেখেছে। এই যাবতীয় অন্যথায় নিরত না থেকে যাবতীয় অন্যথা থেকে বিরত থাকার এই যে সংযম এইটিও একধরনের দণ্ড। একে বলে আন্তর্দণ্ড—অর্থাৎ যে দণ্ড স্বশাসনজনিত, নিজের দ্বারা আরোপিত। নিজমর্যাদার থেকে স্খলন ঘটলে অন্যের শাসন এসে পড়বে এই ভয়ে নিজেকে আগেই সংযত করার নাম হল আন্তর্দণ্ড। দুই, কেউ কেউ অন্যথা করেন এবং করে দণ্ডিত হন। এটি হল বাহ্যদণ্ড। বাহ্যদণ্ড আসলে আন্তর্দণ্ডেরই সহায়ক। আপন মর্যাদা থেকে স্খলিত হয়ে যিনি দণ্ডলাভ করলেন তিনি, আশা করা যায়, ভবিষ্যতে দণ্ডের ভয়ে স্বীয়মর্যাদার অন্যথা আর কিছু করবেন না। অর্থাৎ তিনি আন্তর্দণ্ড শিক্ষা করবেন। অর্থাৎ বাহ্যদণ্ডের অনুষ্ঠানে আন্তর্দণ্ডের উদ্বোধন। আন্তর্দণ্ডের দর্শন হল ইন্দ্রিয়জয় আর এইটিই হল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্র ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার উপর নির্ভরশীল।

দণ্ডনীতির উৎস কী?

৫৮। দণ্ড কী এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্র কাকে বলে আলোচনা করার পর দণ্ডনীতি শাস্ত্রের উৎপত্তি কী করে হল তা আলোচনা করা যেতে পারে। মহাভারতের সূত্রাধ্যায়ে বলা হয়েছে যে এমন একটি সময় ছিল যখন পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড, দণ্ডী কিছুই ছিল না। প্রজারা ধর্মভাবে বাস করতেন এবং নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতেন। এইভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হবার পর প্রজাদের মধ্যে বিভ্রম উপস্থিত হল। তারা লোভগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে বিকৃতি দেখা দিল এবং তাদের ধর্ম ও বিদ্যা বিনষ্ট হতে লাগল। তখন আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবতারা পিতামহ ভগবান ব্রহ্মাকে স্মরণ করলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তখন লোককুলের কল্যাণের জন্য এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একখানি

মহাগ্রন্থ রচনা করলেন। এই মহাগ্রন্থ পিতামহরচিত বলে এর নাম 'পৈতামহতন্ত্র'। এই গ্রন্থে ছিল কয়েক লক্ষ শ্লোক। তার সার সঙ্কলন করে দশহাজার অধ্যায়ে ভগবান বিশালাক্ষ মহাদেব একটি তন্ত্ররচনা করেন। এর নাম 'বৈশালক্ষ তন্ত্র'। এই তন্ত্রের সার সংগ্রহ করে পাঁচ হাজার অধ্যায়যুক্ত একটি তন্ত্র রচনা করেছিলেন ভগবান ইন্দ্র। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র অনেকাংশে এই গ্রন্থের কাছে ঋণী। সেখানে ইন্দ্রকে বাহুদন্তীর পুত্র বলা হয়েছে। তাই ইন্দ্রপ্রণীত তন্ত্রের নাম 'বাহুদন্তক তন্ত্র'। এই তন্ত্রের সার সংগ্রহ করেছিলেন ভগবান বৃহস্পতি। তিনি তিন হাজার অধ্যায়ে একটি তন্ত্র রচনা করেন। তার নাম 'বার্হস্পত্য তন্ত্র'। এই তন্ত্রের সার রচিত হল এক হাজার অধ্যায়ে। রচনা করলেন ভগবান শুক্র (উশনা)। তাই এই তন্ত্রের নাম 'ঔশনস তন্ত্র'। এই সমস্ত শাস্ত্রের মূল বক্তব্য কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে সংগৃহীত হয়েছে। কৌটিল্য নিজেই বলেছেন যে তিনি পূর্বাচার্যগণের জ্ঞানকে সঙ্কলিত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। অনুরূপভাবে কৌটিল্যের জ্ঞান থেকে সঞ্চয় করে রচিত হয়েছিল কামন্দকনীতিসার। এই গ্রন্থের মতো আরও একটি গ্রন্থ ছিল যা পূর্বাচার্যগণের জ্ঞানকে সমন্বিত করে রচিত হয়েছিল, তা হল শুক্রনীতিসার।

৫৯। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আরও অনেক প্রণেতা ছিলেন। তারাও এ-শাস্ত্রের আচার্য, যেমন, প্রাচেতস মনু, ভগবান ভরদ্বাজ, গৌরশিরা মুনি ইত্যাদি। মহাভারতে বলা হয়েছে যে অসুররাজ শম্বরও দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। শম্বর আসলে অর্থনীতি রচনা করেছিলেন। প্রাচীনকালে অর্থনীতি ও দণ্ডনীতি ছিল সমার্থক। এই অর্থে কৌটিল্যের অর্থনীতি আসলে দণ্ডনীতি। দণ্ডনীতিকে অনেক সময় 'ব্যবহার' বলা হত। স্বায়ম্ভুব মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের নবম[৪৬] প্রকরণ হল ব্যবহার। তাকে অবলম্বন করেই দেবর্ষি নারদ ব্যবহারমাতৃকা রচনা করেছিলেন। এইটিই হল নারদস্মৃতি। ব্যবহার হল দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির একটি অধ্যায় হল ব্যবহার। এই অধ্যায়ের টীকা মিতাক্ষরা—নারদস্মৃতির অবলম্বনে রচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দণ্ডনীতির এই ব্যবহার নামক ধারাটি স্বায়ম্ভুব মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ভুত। ধর্মশাস্ত্র আসলে দণ্ডনীতিশাস্ত্র নয়, যদিও তার মধ্যে দ্বিতীয়টির আলোচনা আছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন

৪৬. এই শাস্ত্রের ২৪টি প্রকরণ আছে : (১) লোকসৃষ্টি, (২) ভূতপ্রবিভগ, (৩) সন্দেশপ্রমাণ, (৪) পর্ষৎ লক্ষণ, (৫) বেদ নিরূপণ, (৬) বেদাঙ্গ নিরূপণ, (৭) যজ্ঞ বিধান, (৮) আচার, (৯) ব্যবহার, (১০) কণ্টক শোধন, (১১) রাজবৃত্ত, (১২) বর্ণবিভাগ ও আশ্রম বিভাগ, (১৩) বিবাহ ন্যায়, (১৪) স্ত্রীপুংসবিকল্প, (১৫) দায়ানুক্রম, (১৬) শ্রাদ্ধ বিধান, (১৭) শৌচাচারবিকল্প, (১৮) ভক্ষ্যাভক্ষ্যলক্ষণ, (১৯) বিক্রেয়াবিক্রেয়মীমাংসা, (২০) পাতকভেদ, (২১) স্বর্গ-নরকানুদর্শন, (২২) প্রায়শ্চিত্ত, (২৩) উপনিষৎ, (২৪) রহস্যস্থান। বর্তমানে যে মনুসংহিতা প্রচলিত আছে তাতে ২৪টি প্রকরণ পাওয়া যায় না। তা ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রাচেতস মনু। মহাভারতে দক্ষ প্রজাপতিকে প্রাচেতস মনু বলা হয়েছে। মানব অর্থশাস্ত্র থেকে মানব ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন।[৩৭] দ্বিতীয়টিকে যথার্থভাবে মনুসংহিতা বলা উচিত। ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুর ধর্মশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন দেবর্ষি নারদ। নারদের সঙ্কলনকে ছোট করেছিলেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়। মার্কণ্ডেয়র সঙ্কলনকে আরও ছোট করেছিলেন সুমতি ভার্গব। ভার্গবের সঙ্কলনই আমাদের কাছে মনুসংহিতা নামে প্রচলিত। মনুসংহিতার ভাষ্যকার ছিলেন মেধাতিথি।

৬০। উপরের আলোচনা থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির আকর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে জানতে পরি। এসব গ্রন্থগুলির মধ্যে যে-কটি আজও আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাদের সবকটিই যে আদিগ্রন্থ বা মূলরচনার সঙ্গে এক একথা বলা যাবে না। শত শতাব্দী ধরে এই গ্রন্থগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জনা হয়েছে। ইতিমধ্যে হয়তো কোন কোন গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে এবং তাদের রচনার কিছু কিছু অংশ প্রক্ষিপ্তভাবে পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ মনুসংহিতা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। যে মনুসংহিতা আমরা এখন পড়ে থাকি তার শ্লোকসংখ্যা ২,৬৮৪। অথচ সুমতি ভার্গব কর্তৃক সঙ্কলিত মনুসংহিতার শ্লোকসংখ্যা চার হাজার। নারদস্মৃতির ভূমিকাতে একথা বলা আছে। তাহলে ভার্গব-সঙ্কলনের ৪ হাজার শ্লোকের অনেকগুলিই আজ বিলুপ্ত। আবার মেধাতিথি, মনুসংহিতার ভাষ্যকার, এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অন্য কথা, নারদস্মৃতির ভূমিকার সঙ্গে মেলে না। তিনি বলেছেন মানবধর্মশাস্ত্র প্রজাপতির রচনা এবং তাতে একলক্ষ শ্লোক আছে। এই গ্রন্থকে মনু এবং অন্যান্য ঋষিরা ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করেছেন। মেধাতিথি নারদস্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে এ-কথা বলেছেন। অথচ নারদস্মৃতিতে যে বক্তব্য আমরা পাই তা মেধাতিথির বক্তব্যের সঙ্গে মেলে না। এইভাবে দেখা যাচ্ছে একটি গ্রন্থ নিয়ে কত বিরোধ।

৬১। কোন গ্রন্থ কে প্রণয়ন করেছেন এই নিয়ে যেমন বিরোধ আছে সেইরকম প্রণীত গ্রন্থের কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে কবে রচিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিকরা আজও সঠিকভাবে বলতে পারেন না। ঐতিহাসিক স্মিথ (Vincent Smith) এবং শামশাস্ত্রী (Shama Sastri) মনে করেন যে অর্থশাস্ত্র খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। ইয়োলি (Jolly) অর্থশাস্ত্র সম্পাদনা করার সময় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীকে এই গ্রন্থ রচনার কাল বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতকে সমর্থন

৩৭. 'যাহা হউক, মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিলে ইহাকে আচারস্থিতিহেতুভূত ধর্মশাস্ত্র বলিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র হইতে পারে না। মহাভারতে যে মানব অর্থশাস্ত্রের কথা আছে, তাহা স্বায়ম্ভুব মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র নহে। অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকাতেই আমরা ধর্মশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্র বলিয়া থাকি"—যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ পৃ. ১১।

করেছেন ভিন্টারনিজ (Winternitz), তাঁর *History of Indian Literature* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। এই মতকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন শামশাস্ত্রী এবং নরেন্দ্রনাথ লাহা (N. N. Law)। ১৯২৯ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (পৃ. ৭৭-৮৯) জনৈক পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং আর্যশূরের লঙ্কাবতার সূত্র এ-দুটি গ্রন্থের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অনেক মিল রয়েছে। এর থেকে তিনি অনুমান করেছেন যে অর্থশাস্ত্র রচিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় শতাব্দীর সূচনা থেকে আরম্ভ করে ১৫০ বা খুব বেশি হলেও ২৫০ বছরের মধ্যে। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রাচীন ভারতের যে রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন তাতে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে অর্থশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। অতীন্দ্রনাথ বোস তাঁর *Social and Rural Economy of Northern India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনার পর দেখিয়েছেন যে অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল হল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী।

৬২। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির আকর গ্রন্থগুলির কোন কোনটির রচয়িতা ও তাদের সাল-তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অথচ এই গ্রন্থগুলি দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালনা করেছে। এই পরিচালনার জন্য রচিত হয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট্রশাসনের নির্দিষ্ট নীতি। সম্মিলিতভাবে এই নীতিই হল দণ্ডনীতি। তাহলে দণ্ড হল সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন বা শাসনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনা। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, কামদেব প্রমুখ ঋষি সম্বন্ধে যে-উল্লেখ আছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজা দশরথের রাজ্য পরিচালনা করতেন এইসব ঋষিরা। তাঁরাই ছিলেন সেযুগের রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা, তার ধারক ও বাহক। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর শূন্য রাজসিংহাসনে কে আরোহণ করবেন, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, জাবালি, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিরা অযোধ্যার রাজসভায় মিলিত হয়েছিলেন। মহাভারতে আমরা দেখি যে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসন নিয়ে নানাবিধ উপদেশ দান করেছেন। এইরকম আরও উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায়। একদা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরী থেকে হস্তিনা নগরীতে যাচ্ছিলেন। পথে ব্রহ্মশ্রীতে তিনি কান্তিমান ঋষিদের দেখতে পান। তাঁদের প্রশ্ন করে তিনি জানাতে পারেন যে তাঁরাও হস্তিনাতে যাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা শুনবেন না।

> 'মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ। সমুদায় লোকের কুশল?

ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?'

'তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

'এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন, আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।'

(কৃষ্ণচরিত্র, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্কিমরচনাবলী,
দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৩৭)

৬৩। এখানে দুটি কথা লক্ষণীয়, এক, প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণদের শাসনে ছিলেন। দুই, মুনি-ঋষিরা সরাসরি অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতির প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে রাষ্ট্রচালকদের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির রচয়িতাদের সবসময়ে এক গভীর যোগাযোগ থাকত। কখনও ছিল তা প্রত্যক্ষ, কখনও বা পরোক্ষ। দ্রোণাচার্য কৌরবপক্ষের সেনাপতি হবার পর বলেছিলেন : 'আমি যেমন ষড়ঙ্গবেদ অবগত আছি, এইরূপ আমি মানবীয় অর্থশাস্ত্রও অবগত আছি।' (দ্রোণপর্ব, ৭ অধ্যায় ১ম শ্লোক)। তাহলে বেদ ও অর্থশাস্ত্র উভয়কে জানাই ছিল আবশ্যক আর যারা রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাঁরা এ-দুটির কোনটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারতেন না।

অর্থশাস্ত্র কী?

৬৪। এখন প্রশ্ন হল, অর্থশাস্ত্র কী এবং ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে কতগুলি শব্দ প্রায় সমার্থক ছিল। সেগুলি হল দণ্ড, দণ্ডনীতি,

অর্থশাস্ত্র, রাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও রাজধর্ম। এসবগুলির দ্বারা বোঝাত শাসনধর্ম, শাসনতন্ত্র বা শাসননীতি। কার শাসন? মূলত রাজার শাসন—অন্তত বিখ্যাত পণ্ডিত সালেতোর-এর অভিমত হল এই (*Ancient Indian Political Thought and Institution* B. A. Saletore, p. 15)। রাজার ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত, প্রশাসন বিজ্ঞানের রূপ কী হওয়া উচিত এসব প্রশ্নের মীমাংসা আছে অর্থশাস্ত্রে। সালেতোর বলেছেন যে 'সম্পদের উৎপাদন ও আহরণের ধারাবলী', ('regulations relating to the productions and acquisition of wealth....') অর্থশাস্ত্রে নিবদ্ধ। একথাকে আপাত সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা সর্বৈব সত্য নয়। ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন বণ্টন, সম্পদের আহরণ ও সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে। প্রাচীনকালে এগুলিকে বলা হত বার্ত্তা শাস্ত্র। পৈতামহতন্ত্রে পিতামহ ব্রহ্মা চারটি বিদ্যার কথা বলেছেন—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি।[৪৮] 'তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যাই আন্বীক্ষিকী'; 'আন্বীক্ষিকীবিদ্যা পুরুষের প্রজ্ঞা, বাক্য ও ক্রিয়ার নৈর্মল্যসম্পাদক, ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে পুরুষের বুদ্ধিকে স্বস্থ ও অবিকৃত রাখে'। প্রথম অংশটি ভগবান মনুর মত, দ্বিতীয়টি কৌটিল্যের। মনু সপ্তম অধ্যায়ে এবং কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের বিদ্যোদ্দেশ প্রকরণে উপরোক্ত চারটি বিদ্যার কথা বলেছেন। ত্রয়ী বিদ্যাতে আছে ধর্মাধর্ম—বেদবিদ্যা। বার্ত্তাবিদ্যাতে আছে অর্থ ও অনর্থ, অর্থাৎ 'কৃষি বাণিজ্য ও পশু পালনাদি—যাহা ধনার্জনের উপায়, তাহার প্রতিপাদকশাস্ত্রই বার্ত্তাশাস্ত্র...'। অতএব বার্ত্তাবিদ্যাই হল বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞান। দণ্ডনীতিবিদ্যাতে আছে নয় (নীতি) ও অপনয় (দুর্নীতি), অর্থাৎ পরিপূর্ণ শাসনের প্রকল্প। রাজার হস্তধৃত শাসনের হাতিয়ারের নাম হল দণ্ড।[৪৯] এই দণ্ড ব্যবহারের যে নীতি তাই হল দণ্ডনীতি। অর্থাৎ দণ্ডনীতি হল শাসননীতি। অবশ্যই তা রাজশাসনের নীতি।

৪৮. 'ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ। দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ'।। —মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনের ৫৯ অধ্যায়ের (সূত্রাধ্যায়ের) ৩৩ শ্লোক।

'ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ'।।

—মনু। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির রাজধর্ম প্রকরণেও এই চারটি বিদ্যাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

৪৯. The term *danda* appears to have been used in different periods of antiquity for a staff that was meant to ward off demons, who came to disturb a sacrifice, or for driving away cattle, or for signifying the attainment of manhood by a youth on the completion of his initiation (*Upanayanam),* or for the handle of a ladle, or a similar implement used in a sacrifice, or, as in most cases, for a weapon. The last meaning ultimately prevailed over

রাজশাসনের চারনীতি

৬৫। রাজশাসনের চারটি নীতি পুরাকালে প্রাধান্য পেয়েছিল—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। সাম হল সাধু উপদেশের দ্বারা শাসন (Persuasion and Conciliation)। দান হল পারিতোষিক, উপঢৌকন ইত্যাদি প্রলোভনের আয়োজন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন (Grants and Endowments)। ভেদ হল একজন থেকে আরেকজনের প্রভেদ নির্ণয় করে একজনকে উপেক্ষা ও আরেকজনকে সমাদরের মধ্য দিয়ে যে শাসন (Coercion)। তাহলে রাজার শাসন মানেই দণ্ডনীতির প্রয়োগ নয়। তাই যদি হত তবে সূর্যবংশের সম্রাট মহারাজ সাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জা প্রজাপীড়ক হয়েও রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। এইভাবে চন্দ্রবংশীয় সম্রাট মহারাজ প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপিকে প্রজাগণ রাজপদে বরণ করতে অস্বীকার করেছিলেন বলেই তিনি রাজা হতে পারেননি। আসলে রাজধর্মের মূল কথাই ছিল প্রজাপালন এবং সেই কারণেই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে রাজধর্মকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শরশয্যার শয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—'হে মহারাজ! এই অনাদিসিদ্ধ রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে—দণ্ডনীতির উচ্ছেদ ঘটিলে সমস্ত বেদ বিলুপ্ত হইবে, সমস্ত বিবৃদ্ধ ধর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইবে এবং সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ ঘটিবে'। (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ, পৃ. ৯) । একই কথা মহাভারতের অন্যত্র বলা হয়েছে : শান্তিপর্বের ৬৩ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, 'আমরা বেদ হইতে ইহাই অবগত হইয়া থাকি—সমস্ত ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম রাজধর্ম্ম দ্বারাই রক্ষিত হয়। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মের অন্তর্গত; যেমন সমস্ত জীবের পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্ন দ্বারা গ্রস্ত হয়। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে সূক্ষ্মভাবে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম-প্রধান; যেহেতু সমস্ত জীবই রাজধর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে, সমস্ত ত্যাগই রাজধর্ম্মে বিদ্যমান; আর ত্যাগই সনাতন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সমস্ত বিদ্যাই রাজধর্ম্মের সহিত যুক্ত এবং সমস্ত লোক রাজধর্ম্মেই প্রবিষ্ট। রাজধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইয়া কোনও ধর্ম্মই অবস্থান করিতে পারে না' (ঐ)।

রাজধর্ম কী?

৬৬। উপরে যে রাজধর্মের কথা বলা হয়েছে তা আসলে শাসনের মধ্য দিয়ে কল্যাণের ধর্ম। সাধারণভাবে আমরা ধর্ম বলতে বুঝি সেই শক্তি যা সমাজকে ধারণ

all the rest and because of the nature of the factors that brought the ancient Indian State into existence, came to be finally and irrevocably identified with the science of government' –B.A. Saletore, *Ancient Indian Political Thought and Institutions, p. 15.*

করে।[৫০] রাজশক্তি যখন সমাজকে ধারণ করতে সক্ষম হয় তখনই তা রাজধর্মের রূপলাভ করে। প্রাচীন ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন যে সত্যের উদ্বোধন না ঘটলে শিবের উপাসনা হয় না। তাই সত্যপরায়ণতা (Righteousness) ধর্মের মূল কথা বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।[৫১] তা হলে দেখা যাচ্ছে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম ধর্ম আর ধর্মযুক্ত রাজ্যশাসনই হল রাজধর্ম বা দণ্ডনীতি। সুচারুরূপে প্রজাপালনের মধ্যে রাজধর্মের সার্থকতা—অন্তত বেদের যুগ থেকে এ-ধারণাই ভারতবর্ষে চলে আসছিল।[৫২] মনে রাখা দরকার যে প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রাজার উপর আরোপ করা হয়নি। তা করা হয়েছিল ধর্মের উপর।[৫৩] অতএব ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজার শাসন প্রকৃত শাসন নয়, তা অত্যাচারের নামান্তর। মহাভারতে নারদের যে অনুশাসন আছে তাতে একথা স্পষ্ট। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'হে মহারাজ! তুমি উগ্রদণ্ডদ্বারা প্রজাগণকে উদ্বিগ্ন কর না ত? মন্ত্রিগণ তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা তোমার রাজশাসন করে না তো?' এই উগ্র শাসনকে বন্ধ করবার জন্যই প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা শাসনকে ধর্মের পাদপীঠে স্থাপন করেছিলেন। মনু স্পষ্ট করেই বলেছেন যে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে রাজা যজ্ঞের ফললাভ করবেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হবেন।[৫৪] সদাচরণে বিফল হলে রাজাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করার কথাও মনু বলেছেন।[৫৫] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

৫০. ধর্মকথার প্রকৃত অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তা এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

৫১. 'The Word 'Civilization' is a western equivalent for our word Dharma or 'national righteousness'." "This patience, this steadfastness, this sincerity, is *Dharma*—the Substance, the Selfness of things and of men."—Sister Nivedita, *Religion and Dharma* (London, 1915), p. 15.

৫২. 'The protection of the people was the sacred duty of the king'—V. M. Apte, *Political and Legal Institutions* (Chapter XVII) in R.C. Majumdar ed., *The Vedic Age* (*The History and Culture of The Indian People*, Vol. I). p. 355.

৫৩. 'Strictly speaking, Hindu political theory vest Sovereignty in the *Dharma* or law in the widest sense of the temm'—Dr. Beni Prasad, *Political Theory And Administrative System* (chpter XVII) in R. C. Majumder ed., The *Age of Imperial Unity* (*The History And Culture of the Indian People,* Vol. II), p. 319

৫৪. মনুর উল্লেখ করে Dr. Beni Prasad লিখেছেন : 'It is often stated that protection of the people on the part of the king was equal to the performance of the greatest sacifice (*Yjna*) and was conductive to bliss and prosperity.'—ঐ

৫৫. 'By way of prescribing a high standard of conduct to the king, Manu observes that Where another common would be fined one Karshapana, the king shall be fined one thousand, that is the settled rule'—ঐ

ইংরাজিতে যাকে আমরা religion বলি সেই অর্থে ধর্মের কথা দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বলা হচ্ছে না। ধর্মনীতিতে ধর্মের যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন দণ্ডনীতিতে তা হচ্ছে সদুদ্দেশে সদাচরণ।[৫৬]

ধর্মনীতি ও দণ্ডনীতি

৬৭। মনে রাখা দরকার যে সনাতন হিন্দুধর্মের দুটি দিক আছে। একটি হল বিশ্বাসের দিক, আরেকটি হল আচরণের দিক। ব্যবহারিক দিক থেকে আচরণই হল প্রধান। এ-বিষয়টি সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

> "There can be no doubt, however, that Hinduism is basically more a matter of conduct than of belief. Social observances can be either *lokācāras* or Sāstrācāras. The former refers to the socially accepted rules of behaviour (*loka* = people; acāra = conduct) without, necessarily, any sanction in the s'āstras (scriptures), while the latter refers to the s'āstric codes of behaviour.
>
> Some of the *Sāstrācaras* and *lokācāras* are concerned not merely with general codes of conduct (like honestly, unselfish work, kindness, love and so on), but also with details of forms of behaviour, sometimes even specifying performance and rituals. But both *lokācāras* and *Sāstrācaras are considered to be, ultimately, bāhya* (external), and anyone who feels that his temperament is in conflict with the detailed performances need not feel bound by them. Thus *bāuls* and members of certain ***Bhakti*** schools have often declared their rejection of these performances without denying the basic Hindu ideals. Sometimes gurus, or religious teachers, have recommended to their disciples the non-performance of some conventional rites, but this has not made them any less Hindu provided that Hindu ideals and the principles of the social code of conduct have not been denied. In fact the uniting factor among the enormous variety

৫৬. 'While it (*Dharma*) gives absolute liberty in the world of thought. it enjoins a strict code of practice. The theist and the atheist, the sceptic and the agnostic may all be Hindus if they accept the Hindu system of culture and life...what counts is conduct not belief'–S. Radhakrishnan. *The Hindu View of Life* (London, 1927), 1931, pp. & 38.

of religious beliefs and ceremonies which one finds in Hinduism has been a belief in a basic code of behaviour, including selfless work, detachment, honesty, love—that is, in the words of Krishna, 'Hateless towards all born beings, friendly, and pitiful, void of thought of a *Mine* and *I*, bearing indifferently pain and pleasure,' (Bhagavad-Gita, Lesson 12, verse 13).[৫৭] To this may be added a desire to come closer to God in whatever way is found most fit."—K. M. Sen, Hinduism (a Pelican original) pp. 38-39.

৬৮। রাজদণ্ডের ব্যবহার যাতে বিকৃত না হয় সেই দিকে নজর রেখেই প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতিকে ধর্মের পাদপীঠে স্থাপন করা হয়েছিল। অথচ দণ্ডনীতিশাস্ত্র কখনই ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। দুটি শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে আলোচনা করার মতো শিক্ষা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের ছিল। সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হয়তো ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে ততই অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই ভারতবর্ষে দণ্ডনীতিচর্চার শেষ সার্থক ফল। তাই যদি হয় তবে বলতে হবে যে খ্রিস্টীয় শতাব্দীর আগে-পরে দু-একশো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে দণ্ডনীতিশাস্ত্রচর্চা শেষ হয়ে এসেছিল। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় দেখিয়েছেন যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠশতক পর্যন্ত দণ্ডনীতিশাস্ত্রের চর্চা চলেছিল, তার পর থেকেই এই শাস্ত্র উপেক্ষিত হতে থাকে।

দণ্ডনীতির 'অবক্ষয়

৬৯। উপরের মতটিকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমরা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম।

৫৭. গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হল ভক্তিযোগ, তার ১৩-১৪ শ্লোক হল :

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণঃ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যপিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৪

'যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখ-দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত'—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ২৮১।

"৭ম শতকের পূর্বে কোন রাজমন্ত্রীই রাজা বা যুবরাজকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বিতৃষ্ণ করিবার জন্য প্রয়াসী হন নাই। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার আস্বাদ জানিত, তখন তাহাদের চিত্ত কখনও দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বিমুখ হইত না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে অস্বাভাবিকভাবে ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে এক অদ্ভুত অকালবৈরাগ্য উদিত হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে বুদ্ধিমান লোকেরাও এইরূপ বৈরাগ্যের সমর্থনই নিজের বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—হর্ষবর্ধনের পরে তাঁহার মতো প্রভাবশালী অন্য রাজা ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ৭ম শতকের পরে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ পরস্পর বিবাদে রত থাকিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ষষ্ঠ শতকে মহাকবি দণ্ডী যে দশকুমার-চরিত নামক গদ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ৮ম উচ্ছ্বাসে কবি দণ্ডী নীতিশাস্ত্রের আবশ্যকতা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার দণ্ডনীতিশাস্ত্রে নৈপুণ্য কেন আবশ্যক, দণ্ডনীতিশাস্ত্রে পরিজ্ঞান ও শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োগে সুশিক্ষিত না হইলে, রাষ্ট্র কিভাবে বিনষ্ট হয় তাহা মহাকবি দণ্ডী, সুন্দর আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্যবিদ্যাব্যসনী জনগণ দণ্ডনীতিশাস্ত্রে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কিভাবে রাষ্ট্রকে অধঃপাতিত করে তাহারও একটি সুন্দর চিত্র এই ৮ম উচ্ছ্বাসে দণ্ডী দেখাইয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন যে, বিদর্ভদেশে পুণ্যবর্ম্মা নামক একজন রাজগুণভূষিত শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। এই রাজা বহুগুণভূষিত হইলেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রে রাজার শ্রদ্ধা ছিল না। রাজাকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তবর্ম্মার পিতা পুণ্যবর্ম্মাও মন্ত্রী বসুরক্ষিতকে বহু সম্মান করিতেন। এই মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, তুমি বহুগুণভূষিত এবং তোমার বুদ্ধিও প্রখর। নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি ললিতকলাবিদ্যাতে তোমার অসাধারণতা আছে, তথাপি তুমি দণ্ডনীতিবিদ্যাতে পরিশ্রম কর নাই বলিয়া তোমার বুদ্ধি বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। যে রাজা দণ্ডনীতির দ্বারা বুদ্ধি বিশোধন করেন নাই—সে রাজা বুদ্ধিহীন। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বুদ্ধিহীন রাজা অতি সমৃদ্ধ হইলেও শত্রু-রাজগণ কিরূপে তাঁহাকে অবনমিত করিয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারেন না। কোন্ কার্যে রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় ও কোন্ কার্যে রাষ্ট্রের অকল্যাণ হয় তাহা বুঝিতে পারেন না। রাষ্ট্রের শুভাশুভ বুঝিতে না পারিয়া দণ্ডনীতি জ্ঞানহীন রাজা যে সমস্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্যে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় জনগণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় জনগণ দ্বারা অবজ্ঞাত রাজার কোন আদেশই প্রজাগণের কল্যাণসাধন করিতে পারে না। নীতিজ্ঞানহীন রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রজারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে। আর তাহাতে রাষ্ট্রের স্থিতি বিপ্লুত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবাসী জনগণ যখন মর্যাদাশূন্য হইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারা নিজেদের ও রাজার

ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। দণ্ডনীতি লোকযাত্রার প্রদীপ। এই দণ্ডনীতি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে লোকযাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং দূরবর্তী রাষ্ট্রসমূহেরও স্বরূপ অবলোকন করিবার নিমিত্ত এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রই অপ্রতিহত চক্ষু। এই নীতিচক্ষু বিবর্জিত রাজা বিশালচর্মচক্ষুযুক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় বিষয় অবধারণ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে অন্ধই বলা হয়;অতএব হে রাজকুমার। তুমি নৃত্য-গীতাদি বিদ্যাতে অতিশয়িত রুচি পরিত্যাগ করিয়া তোমার কুলবিদ্যা দণ্ডনীতি অভ্যাস কর। এই বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তদনুসারে কার্যের অনুষ্ঠান করিলে রাজশক্তির বৃদ্ধি হইবে, কোন স্থলেই তোমার পরাজয় হইবে না এবং তুমি চিরকাল পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকিতে পারিবে।" (পৃ. ৪২-৪৩)

৭০। এর পর যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় ভারতবর্ষে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অধঃপতনের কথা বলেছেন।

"...৭ম শতকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি হর্ষবর্ধন ভারতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সভায় মহাকবি বাণভট্ট স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব প্রভাবে আদৃত হইয়াছিলেন। এই মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গদ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাদম্বরীর প্রথমভাগে শুকনাশের উপদেশ অতি প্রসিদ্ধ। মন্ত্রী শুকনাশ যুবরাজ চন্দ্রাপীড়কে অনেক বহুমূল্য উপদেশ করিয়াছিলেন এই উপদেশ বাক্যগুলি কবিত্বছটায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু এই সমুজ্জ্বল উপদেশ বাক্যের মধ্যেই এমন কতগুলি কথা আছে যাহাতে বুঝিতে পারা যায়—মহাকবি বাণভট্টের সময়ে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মন্ত্রী শুকনাশ বলিতেছেন—যাহাদের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই প্রমাণ—যে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে অতি নৃশংসপ্রায় উপদেশসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, এই শাস্ত্রের অনুবর্তীগণের অকার্য কি থাকিতে পারে? এই শাস্ত্রানুসারে অভিচারক্রিয়ানিপুণ ক্রূরপ্রকৃতি পুরোহিতগণই রাজার গুরু হইবেন। অন্যের নিগ্রহচিন্তায় নিরত মন্ত্রিগণই রাজার উপদেষ্টা হইবেন। অতীত-সহস্র নরপতিগণকর্তৃক ভুক্ত ও পরিত্যক্ত রাজলক্ষ্মীতে রাজার আসক্তি উৎপাদন করা হইবে। শত্রুবিনাশের জন্যই রাজা শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন এবং স্বাভাবিক প্রীতিসম্পন্ন ভ্রাতৃগণই রাজার উচ্ছেদ্য হইবে।

এই সমস্ত উপদেশ দ্বারা অর্থশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে, ভারতীয় নরপতিগণের স্বাধীনতার মূল শিথিল করা হইয়াছে। বৈরাগ্যসম্পন্ন রাজা কোনদিনই রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। মহারাজ হর্ষবর্ধনের যে ঐশ্বর্য বাণভট্ট দেখিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় হর্ষবর্ধনের বৈরাগ্যলব্ধ নহে। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ভারতীয়গণের চিত্তকে বিরক্ত করিতে ইহারা সহায়ক হইয়াছিলেন।"

(পৃ. ৪১-৪২)

৭ম শতক থেকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের যে-উপেক্ষা আরম্ভ হয়েছিল ৯ম শতকেও তা

বদলায়নি। এই শতকে কাশ্মীরদেশের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন 'জয়ন্তভট্ট'। তিনি দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ বলেছেন : জয়ন্তভট্ট 'দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রকে বিদ্যাবিভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। উৎকট পরলোকরাগ এমনই বিমুগ্ধ করিয়াছিল যে—যে বিদ্যার প্রভাবে সাক্ষাৎভাবে ইহলোক ও পরম্পরাভাবে পরলোক রক্ষিত হইত, সেই দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্র উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল। দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা সাক্ষাৎভাবে পরলোক সাধক নহে। যদিও 'জয়ন্তভট্ট' কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্মার সুশাসিত রাজ্যেই বাস করিতেন এবং রাজার সুশাসনের গুণেই নবমশতকে কাশ্মীরমণ্ডল বিদ্বজ্জনপূর্ণ ছিল এবং ছিল বলিয়াই জয়ন্তভট্ট অসাধারণ পাণ্ডিত্য উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দণ্ডনীতির সুপ্রয়োগের প্রভাবে তাঁহার এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছিল—মাত্র পারলৌকিক ফলের উৎকট তৃষ্ণাতে সেই দণ্ডনীতিশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।'[৫৮] (পৃ. ৪০)

৭১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ এবং বি.এ. সালেতোর যে-মত প্রকাশ করেছেন তা শামশাস্ত্রীর মতের বিপরীত। শামশাস্ত্রীই প্রথম অর্থশাস্ত্রের সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ৬-৭) তিনি বলেছেন যে দণ্ডী অর্থশাস্ত্রকে উপেক্ষা করেছিলেন। তার মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি দশকুমার চরিত-এর ৮ম উচ্ছ্বাসের বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ ও শ্রীসালেতোর-এর বিরাট আলোচনা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শামশাস্ত্রীর ভুল কোথায়। এ-বিষয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থের মতো পুনর্বার উদ্ধৃত করা যায়।

'কবি দণ্ডী অর্থশাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিতের উপদেশে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এ-

৫৮. এ-বিষয়ে Saletore-এর অভিমতটি নিম্নরূপ—
'The cumulative evidence available in the *Daśakumāracarita* clearly demonstrates the fact that centuries after the days of the Mauryan Prime Minister (Kautilya), the latter's principles of Polity had come to stay in the country. Granting that the exact date of Dandin is still one of the many unsolved problems in Sanskrit literature, we many agree with the general Indian view that he flourished in circa A.D. 650. This would mean that in the second half of the seventh century A.D., Kautilya's theories had attained such celebrity as to receive a detailed treatment at the hands of one of the greatest Indian prose writers. when we add to this the testimony of the *Pañcatantra*... we may unequivocally maintain that, from the early centuries B.C. till the seventh century A.D. the principles of Polity as embodied in the *Arathaśāstra* had already crystallized themselves in the minds of the people.'—p. 501

স্থলে বিশেষভাবে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। রাজার চাটুকার 'বিহারভদ্র' রাজাকে বিলাসব্যসনে ডুবাইয়া রাজার সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অসৎ কথা বলিয়াছিল তাহাতেই দণ্ডনীতির নিন্দা করা হইয়াছে। বাক্যের বক্তা ও বোদ্ধব্য নিরূপণ না করিয়া কেবলমাত্র গ্রন্থে আছে—এই মনে করিয়াই যদি তাহাতে গ্রন্থকারের তাৎপর্য নিরূপণ করা হয়, তবে রামায়ণাদি গ্রন্থেও বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণের দুষ্কার্যে তাৎপর্য নিরূপিত হইবে। যেমন রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে মহাপার্শ্ব রাবণকে বলিতেছেন,—হে রাক্ষসরাজ। তুমি সকলের ঈশ্বর তোমার আর কেহ ঈশ্বর নাই; অতএব হে শত্রুঘাতিন্! তুমি বৈদেহীর সাথে নির্বাধে ক্রীড়া কর, তোমার সহিত ক্রীড়া করিতে সম্মতা না হইলে তুমি বলপূর্বক কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পুনঃ পুনঃ সীতাকে আক্রমণ করিয়া ভোগ কর। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে বাল্মীকি পরস্ত্রীধর্ষণে পরামর্শ দিতেছেন?' (পৃ. ৪৩-৪৪)

** ** ** **

৭২। উপরে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিবর্তন আলোচনা করার পর আমরা দণ্ডনীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের যোগ কী ছিল তা আলোচনা করতে পারি। এ-বিষয়ে তিনটি বিশিষ্ট মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতটি হল ধর্মশাস্ত্র থেকে দণ্ডনীতির উদ্ভব ঘটেছে। দ্বিতীয় মতটি হল ধর্মশাস্ত্র থেকে দণ্ডনীতির উদ্ভব ঘটেনি, বরং দুটি বিদ্যাই সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছিল। তৃতীয় মতটি হল দণ্ডনীতি ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী একটি বিদ্যা। প্রথম মতের প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক ভিন্টারনিজ ও ডঃ কেনে। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা হলেন ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও অধ্যাপক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। তৃতীয় মতটি প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক কিথ্।

৭৩। অধ্যাপক ভিন্টারনিজের মত : প্রাচীন ভারতে রাজারা যখন ধর্মশিক্ষা করতেন তখন তার সঙ্গে তাঁদের দণ্ডনীতির শিক্ষা দেওয়া হত। তখন দণ্ডনীতি ছিল ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তী কোন সময়ে দণ্ডনীতি ধর্মশাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র হবার পর দণ্ডনীতি অর্থশাস্ত্ররূপে পরিচিত হতে থাকে। এরপর থেকে রাজপুরুষেরা ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতিশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্রনামে পৃথকভাবে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। মহাভারতে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে অনেক ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাকে দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্ররচয়িতারূপে দেখানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে দুটি শাস্ত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রাচীন ভারতে আলোচিত হত।

৭৪। ভিন্টারনিজের মতের দুটি দিক আছে। একদিকে তিনি বলেছেন যে দণ্ডনীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অর্থশাস্ত্রনামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ মত হয়তো ভুল নয়। অন্যদিকে তাঁর মত হল মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে একই লোককে দুটি শাস্ত্রের রচয়িতা বলে দেখানো হয়েছে। এ মত খুব গ্রাহ্য নয়।

৭৫। ডঃ কেনের মত : ডঃ কেনে বলেছেন যে অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র আপাতভাবে দুটি ভিন্ন শাস্ত্র, তাদের উদ্দেশ্য, পঠন-পাঠন ও বোধের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু মূলত দুটি ভিন্ন নয়। অর্থশাস্ত্র আসলে ধর্মশাস্ত্রের শাখামাত্র। রাজার কর্তব্য কী, এই প্রশ্নের মীমাংসা অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়। অথচ রাজার আচরণ-সংক্রান্ত নানাবিধ নিয়মাবলী ধর্মশাস্ত্রেও আলোচিত হয়েছে—('Though Arthasastra and Dharmasastra are often contradistinguished on account of the difference of the two sastras in ideals and in the methods adopted to reach them, Arthasastra is really a branch of the Dharmasastra as the former deals with the responsibilities of the kings for whom rules are laid down in many treatises on ***dharma***')। কেনে বলেছেন যে রাজধর্ম আসলে ধর্মশাস্ত্রেরই অংশ। আর অর্থশাস্ত্র যেহেতু রাজধর্মকে বিশ্লেষণ করে, রাজার অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব-কর্তব্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে সেইহেতু অর্থশাস্ত্র মূলত ধর্মশাস্ত্রের অংশ।

৭৬। ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার মত : ডঃ লাহা বলেছেন যে ধর্মশাস্ত্রের বিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায় আছে, তাকে 'সূত্র'-অধ্যায় বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বার্তা ও দণ্ডনীতি এবং এ-দুটিকে গ্রহণ করে গড়ে ওঠা অর্থশাস্ত্রেরও একটি 'সূত্র'-অধ্যায় আছে। বিবর্তনের দিক থেকে দণ্ডনীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সমান্তরাল ও সমকালীন ('Just as the dharmasastras had a *sutra* period, so also the branches of learning, *Vartta* and *dandaniti*, utilized by the Arthasastras, passed through a similar *sutra* period, and could well have been contemporaneous with the works of the corresponding stages of development of the *dharmasastras*')।

৭৭। নরেন্দ্রনাথ লাহার মতকে সালেতোর নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন। সালেতোর-এর মতকে সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল।

দণ্ডনীতির বিবর্তনের ইতিহাসে একটি সূত্র-অধ্যায় ছিল—ডঃ লাহার এ-মতকে গ্রহণ করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু গ্রহণ করা সম্ভব নয় ডঃ লাহার অন্য উক্তিটি—ধর্মশাস্ত্রের সূত্র-অধ্যায় বিবর্তনের যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়েছিল দণ্ডনীতির সূত্র-অধ্যায়কে সেই একই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এ উক্তিকে গ্রহণ করতে হলে প্রথমে সূত্র-সাহিত্যকে সঠিকভাবে আলোচনা করতে হবে। সূত্র-সাহিত্যের প্রধান বিষয় গার্হস্থ্য ধর্ম (domestic rituals)। দেখতে হবে যে গার্হস্থ্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সূত্র-সাহিত্যে প্রশাসন ও সরকারতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল কি না। তা যদি না হয় তবে একথা বলা যাবে না যে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায় ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবর্তনের সঙ্গে কালসম্বন্ধযুক্ত বা সমকালীন।

৭৮। ডঃ কেনে বলেছেন যে ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে। কিন্তু সূত্র-সাহিত্যের উদ্ভব কোন মতেই খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে হয়নি। তাহলে কী করে বলা যাবে দণ্ডনীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের সমকালীন বা তার সঙ্গে কালসম্বন্ধযুক্ত? ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কোন মিল নেই। ধর্মশাস্ত্রের উৎস হল বৈদিক সংহিতা। অধ্যাপক জুলিয়াস এগলিং (Julius Eggeling) দেখিয়েছেন যে পরবর্তীকালে এই সংহিতা সাহিত্যকে ছোট করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্রাহ্মণে। তারপর তাকে আরও ছোট করা হল কল্পসূত্রে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মশাস্ত্রকে উত্তরোত্তর ছোট করা হয়েছিল। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক আয়তনকেও এইভাবে ক্রমশ ছোট করা হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পিতামহ ব্রহ্মা যে অর্থশাস্ত্র রচনা করছিলেন তাতে ছিল একলক্ষ অধ্যায়। বিশালাক্ষ মহাদেব সেই মহাগ্রন্থকে দশহাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করলেন। তাকে আরও ছোট করে পাঁচ হাজার অধ্যায়ে তার সার-সংগ্রহ করলেন ইন্দ্র। অতঃপর বৃহস্পতি তাকে ছোট করলেন তিন হাজার অধ্যায়ে। শেষবারের মতো তার সংক্ষেপ রচনা করলেন শুক্র (উশনা)। অর্থশাস্ত্রের আয়তন হল একহাজার অধ্যায়। অর্থশাস্ত্রের এই ক্রমসংকোচনের ঘটনাকে ধর্মশাস্ত্রের ক্রমহ্রাসমানতার অনুরূপ ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। দুটি আপত্তির কথা সালেতোর উল্লেখ করেছেন। এক, মহাভারতে অর্থশাস্ত্রের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়রূপে তিনটি বিদ্যা প্রাধান্য পেয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম। সেখানে অর্থশাস্ত্রকে নিজস্ব অধিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন কোন স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে চিন্তা করা হয়নি। অতএব অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রতন্ত্রের অর্থবাহী স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে বা সাহিত্যরূপে ভাবা যাবে না। দুই, দণ্ডনীতির ক্রমসঙ্কোচনের ধারাটি পরিণতি লাভ করতে পারেনি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে পৈতামহতন্ত্র থেকে ঔশনসতন্ত্র পর্যন্ত দণ্ডনীতি সাহিত্যের কলেবরকে ক্রমশ ছোট করা হচ্ছিল, তাহলে প্রশ্ন জাগে কেন তার পরেও দণ্ডনীতির কলেবরকে আরও ছোট করা হল না? কল্পসূত্রের অনুরূপ দণ্ডনীতির একটি সংহত, সংক্ষিপ্ত অবয়ব হয়ত দাঁড় করানো যেত, কিন্তু অবশেষে তা হল না। অথচ, কৌটিল্যের হাতে অর্থশাস্ত্রের আয়তন বৃদ্ধি পেল, কমল না। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের মত অর্থশাস্ত্রের ক্রমসঙ্কোচনের ধারা একটি পর্যায়ে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তারপর থেকে তা বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে। তাহলে পরিণতিতে অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুটির মধ্যে কোন মিল পাওয়া যাবে না। সালেতোর-এর মতের মূল অংশটি নীচে উদ্ধৃত হল।

> One wonders one could come across this process of gradual reduction in size in the case of the *Dandaniti* : No doubt, as mentioned below, the reduction of the original size of the

Arthasastra from 100,000 stanzas attributed to Brahma, to 10,000 stanzas by Siva as Visalaksa, then, to 5,000 by Indra, then, to 3,000 by Brihaspati, and again, to 1,000 by Usanas. Undoubtedly points to a reduction in size of the earlier versions of the *Arthasastra*. But there are two objections against the assumption that the above necessarily corresponded to the stages of development through which the *Samhitas*, passed, First, according to the *Mahabharata*, the whole literature described in it represents the three topics of *Dharma, Artha* And *Kama*, and not *Artha* alone. This would preclude the *Arthasastra's* or *Dandaniti's* possessing an individuality of its own–a consideration which would rob the strength of the main argument relating to the existence of the *Dandaniti* as a separate body of literature. And, secondly, admitting that there was a gradual reduction in size of the Arthasastra it cannot be understood why a further reduction was not attempted, especially after the age of Usanas, so as to make it truly concise in the manner of the *Kalpa Sutras*. On the other hand, we have the fact that—Kautilya's *Arthasastra* was made up of 6,000 stanzas, 180 sections, 150 chapters, and 15 books, as Kautilya himself informs us. That Mauryan Prime Minister, therefore, not only did not observe the main characteristic of the *Sutra* literature, namely, the reduction in size of the earlier manuals of a statecraft, but raised it to a size higher than that attributed to Indra himself, viz., 5,000 slokas! Here is a fact which seems to violate any assumption that the *Dandaniti* literature could be made to agree with the Dharmasastra literature in the matter of a parallel development.' (পৃ. ১৮)

৭৯। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে

শাস্ত্রসমুদ্দেশঃ—পঞ্চদশাধিকরণানি, সপঞ্চাশদধ্যায়শতং,

সাশীতি প্রকরণশতং ষট্‌শ্লোকসহস্রানীতি।।

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—রাধাগোবিন্দ বসাক)

'এই শাস্ত্রের বিষয়-সূচী আছে এইরূপ : ইহাতে ১৫টি অধিকরণ, ১৫০টি অধ্যায় ও ১৮০টি প্রকরণ এবং ৬০০০টি শ্লোক আছে (অর্থাৎ ইহাতে সন্নিবেশিত অক্ষরসমূহ দ্বারা ৬ হাজার ৩২ অক্ষর বিশিষ্ট শ্লোক বা গ্রন্থের রচনা সম্ভবপর হইতে পারে)'

(ঐ পৃ. ৭)

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ৬০০০টি শ্লোক ছিল, অধ্যায় নয়। সালেতোর এই শ্লোকেরই ইংরাজি তর্জমা করে বলেছেন stanza। তাহলে তিনি যখন বলেন ব্রহ্মা রচিত অর্থশাস্ত্রে ১০০,০০০ stanza ছিল তখন তিনি শ্লোকই বুঝিয়েছেন। এ-কথা বোধহয় ঠিক নয়। পৈতামহতন্ত্রে শ্লোকসংখ্যা কত ছিল আমরা জানি না, কিন্তু অধ্যায় সংখ্যা ছিল ১০০,০০০। আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অধ্যায় সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০টি। তাহলে দণ্ডনীতির ক্রমসঙ্কোচনের ধারাটি বরাবর অব্যাহত ছিল। সালেতোর সম্ভবত এই বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শ্লোকসংখ্যার সঙ্গে অন্যান্য পূর্বাচার্যগণের রচিত গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। দণ্ডনীতির ক্রমসঙ্কোচন নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের মতটি নীচে উদ্ধৃত হল :

"এই পৈতামহতন্ত্র যে অতি বিশাল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে গ্রন্থের এক লক্ষ অধ্যায়, তাহার প্রতি অধ্যায়ে ২০টি শ্লোক থাকিলেও সেই গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ হয়। এইরূপ বিশাল গ্রন্থ যে সাধারণ মানুষের অধ্যয়নযোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য ভগবান্ বিশালাক্ষ মহাদেব এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া দশ হাজার অধ্যায়যুক্ত একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম শৈবালক্ষতন্ত্র।.... ভগবান ইন্দ্র এই বৈশালাক্ষ তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া পাঁচ হাজার অধ্যায়ে আর একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম বাহুদন্তক তন্ত্র। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে এই তন্ত্র হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলে ইন্দ্রকে বাহুদন্তীর পুত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই বাহুদন্তক তন্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্বক তিন হাজার অধ্যায়ে ভগবান বৃহস্পতি আর একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম বার্হস্পত্য তন্ত্র। এই বার্হস্পত্য তন্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্বক ভগবান্ শুক্র (উশনা) এক হাজার অধ্যায়ে আর একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম ঔশনস তন্ত্র। এই সমস্ত তন্ত্র হইতেই সিদ্ধান্তসমূহ, কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে কৌটিল্য বলিয়াছেন—'পৃথিবীর লাভ ও পালনাদির জন্য পূর্বাচার্যগণ যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়ছিলেন, প্রায়শঃ সেই সমস্ত গ্রন্থ একত্র সঙ্কলিত করিয়া এই অর্থশাস্ত্র (দণ্ডনীতি) সঙ্কলিত হইল'।"

৮০। যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির ক্রমসঙ্কোচনের ধারাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সালেতোর সম্ভবত এই ধারাটিকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেননি।

৮১। অধ্যাপক আয়েঙ্গারের মত : অধ্যাপক আয়েঙ্গারের মত হল যে দণ্ডনীতির উদ্ভব ধর্মশাস্ত্র থেকে নয়; দণ্ডনীতি শুরু থেকে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে গড়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছেন : 'নীতিশাস্ত্রের মধ্যে আমরা এমন এক ধরনের সাহিত্যের অবস্থান দেখতে পাই যা সূচনায়, দৃষ্টিকোণে, ঝোঁকে এবং মানে ধর্মপুস্তকগুলি থেকে স্বতন্ত্র (In the

Nitisastras we have, on the other hand, an independent body of literature, whose origin, standpoint, outlook, and standards differ from those of the canonical law books)'। অধ্যাপক আয়েঙ্গার আরও বলেছেন : 'অর্থশাস্ত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ (Dharmasastra is stronger than Arthasastra)'। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে একথা বলেছেন। ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে অর্থশাস্ত্রকে তার অংশ বলে ধরে নিতে হবে। কৌটিল্য স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, তা বলে অর্থশাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অস্বীকার করেননি। অধ্যাপক আয়েঙ্গারের মতও তাই। ধর্মশাস্ত্রের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে অর্থশাস্ত্রের প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে তিনি নারাজ—('It is hardly necessary to enlarge further on this difference between the canonical law books and the books on polity. It should suffice to say that it is on this ground that a canonical law book would claim to supersede a mere work on polity')

৮২। অধ্যাপক কিথের (A.B. Keith) মত : অধ্যাপক কিথ মনে করেন যে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, দণ্ডনীতি, এগুলি সব সমার্থক। সবগুলির বিষয় ও উদ্দেশ এক—বিষয় রাজা বা শাসকের আচরণবিধি, উদ্দেশ তার নিয়ন্ত্রণ। সবগুলি একত্রে রাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সূচিত করে। যৌথভাবে বা পৃথকভাবে এগুলির কোনটির সঙ্গেই ধর্মশাস্ত্রের যোগ নেই। মানুষের নৈতিক জীবন অর্থশাস্ত্রের বিষয় নয়। ধর্মশাস্ত্রের সেইটি হল মূল বিষয়। অর্থশাস্ত্রের বিষয় হল রাজনীতিতে অথবা বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের ভূমিকা। তার বাইরে প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের সাধারণ দেওয়া-নেওয়া, আচার-ব্যবহারও অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ধর্ম ও নৈতিক জীবন যা ধর্মশাস্ত্রের আলোচ্য তা কখনই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দণ্ডনীতি ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত (Dandaniti was opposed to the Dharmasastras)। সালেতোর একটি বাক্যে চমৎকারভাবে অধ্যাপক কিথের মতটিকে ব্যক্ত করেছেন : 'The advocate of this theory was Professor A. B. Keith who, while admitting that the *arthasastras* or the *nitisastras* or the *rajniti* or the *dandaniti* were one and the same, viz., the science of conduct. or the conduct of kings, affirmed that the *arthasastra* and the *nitisastra* were opposed to the *dharmasastra* in as much as they are not codes of morals but deal with man's action in practical politics and conduct of the ordinary affairs of every day life and intercourse.'

৮৩। সালেতোরের মত : উপরে যে তিন ধরনের মতের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি মতই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রাহ্য। সালেতোর বলেছেন সেটি হল এই, দণ্ডনীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ভূত। এই মতটিকে বুঝবার জন্য সালেতোর বলেছেন, তিনটি স্বতন্ত্র

সমস্যার আলোচনা হওয়া দরকার : এক, প্রাচীন ভারতীয়দের মতে সমস্ত জ্ঞানের উৎস কি ; দুই, ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তার যোগ কি ; এবং তিন, মনুস্মৃতি অনুযায়ী ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতির যোগ কোথায়। সনাতন ভারতীয়দের মতে সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল বেদ। বেদ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত বিদ্-ধাতু থেকে। বিদ্-ধাতুর অর্থ হল জানা (To know)। যেহেতু সমস্ত কিছু জানার রহস্য বেদের মধ্যে লুকিয়ে আছে, অতএব বেদই হল সমস্ত জ্ঞানের আকরগ্রন্থ। বেদের আরেক নাম 'শ্রুতি'। ঈশ্বরের বাণী শ্রুত হয়ে বেদের রূপ নিয়েছিল। তাই তার নাম শ্রুতি। ইংরাজিতে যাকে বলে revelation বেদ হল তাই, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উন্মীলন। শ্রুতি আর স্মৃতি এক নয়। শ্রুতি অনেক আগের, স্মৃতি অনেক পরের। শ্রুতির বৈধতা তর্কাতীত, অলঙ্ঘ্য, অখণ্ড। স্মৃতি হল tradition চলতি ধারা। অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল (Macdonell) এই দুয়ের প্রভেদকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : বিরোধের ক্ষেত্রে বেদ বা শ্রুতির মীমাংসাই গ্রাহ্য, স্মৃতির নয়, কারণ শ্রুতির উন্মীলন হল সত্য, তার কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত, স্মৃতি হল সাধারণ ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবহর অথবা তার চলতি ধারা যা মুনি-ঋষিদের সময় থেকে চলে আসছে—('Works of Vedic 'revelation' were deemed of higher authority in case of doubt than the latter works on religions and civil usage, called smriti or memory, as embodying only the tradition derived from the ancient sages.')। জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে এই হল সালেতোরের বক্তব্য।

৮৪। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় আসা যাক—ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক কী? এর উত্তর দিতে গিয়ে সালেতোর মনুসংহিতার সাহায্য নিয়েছেন। মনু বলেছেন যে সমস্ত জ্ঞানের এবং সমস্ত ধর্মের উৎস হল বেদ। বেদের অনেক নীচে ধর্মের আরও কতগুলি উৎস আছে, যেমন, প্রচলিত ব্যবস্থা (tradition), বেদজ্ঞ যারা তাদের আচরণ, সাধু ব্যক্তির জীবনচর্যা এবং সর্বোপরি মানুষের আত্মচরিতার্থতা (self-satisfaction)। মনুকথিত ধর্মের এইসব উৎসের কথা বেদে বলা আছে—এটি মনুর নিজের স্বীকৃতি। আমরা যাকে প্রচলিত ব্যবস্থা বা tradition বলেছি তাকেই মনু বলেছেন স্মৃতি। একস্থানে মনু বলেছেন ধর্মের চারটি রাস্তা—বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি, সাধুব্যক্তির প্রদর্শিত জীবনচর্যা এবং মানুষের আত্মসেবা (One's own pleasure)। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের আকরই হল বেদ—যে বেদ সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

৮৫। এবার আমরা তৃতীয় প্রশ্নে আসি—বেদ থেকে উদ্ভূত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের যোগ কোথায়? সালেতোর বলেছেন যে মনুসংহিতায় কোথাও কোথাও দণ্ডনীতিকে ধর্মের সঙ্গে প্রায় সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। যদিও প্রাচীন ভারতীয়রা ধর্মশাস্ত্রকে দণ্ডনীতির থেকে হীন বলে ভাবতেন না, তবুও স্থানে স্থানে যে দণ্ডনীতি ও ধর্মশাস্ত্র সমান প্রাধান্য পেয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। সালেতোর বলেছেন যে দণ্ড সম্বন্ধে মনুর

মত খুব স্পষ্ট : দণ্ডের দ্বারা সমস্ত প্রাণী নিয়ন্ত্রিত হয়, দণ্ডই তাদের পালন করে, তাই পণ্ডিতরা দণ্ডকেই ধর্মের সমার্থক বলে জানেন—('Punishment alone governs all created beings, punishment alone protects them.... the wise declare punishment to be identical with law')। উপরের এই উক্তির মধ্যে দণ্ড ও ধর্মের সমান প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ধর্মশাস্ত্র তার বিবর্তনের যে যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, দণ্ডনীতিশাস্ত্রও সেই একই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে তার পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। ('This would appear to lend support to the view that the *dandaniti* passed through the stages of development similar to those which the *dharmasastras* passed through; and that it had the same status as the *dharmasastras*')।

৮৬। উপরের এই মতকে মেনে নিলেও একথা বলা যাবে না যে ধর্মশাস্ত্র থেকে দণ্ডনীতির প্রাধান্য বেশি ছিল অথবা ধর্মশাস্ত্রের আগে দণ্ডনীতির উদ্ভব হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রের অগ্রাধিকার প্রাচীন ভারতে সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। কৌটিল্য নিজেই বলেছেন যে বেদত্রয় ঋক্, যজুঃ ও সাম থেকে ধর্মাধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ধনাধনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে বার্ত্তাশাস্ত্র থেকে। আর 'বলাবল' অর্থাৎ শক্তি অশক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে দণ্ডনীতি থেকে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে দণ্ডনীতি থেকে ধর্মশাস্ত্রের প্রসার ও পরিধি অনেক বেশি এবং মানবজীবনে তার ব্যঞ্জনা অনেক গভীর। দণ্ডনীতি শুধু রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষমতা-অক্ষমতার জ্ঞান দেয়। ধর্মশাস্ত্র সূচিত করে সমস্ত মানব সমাজের তাৎপর্য। অন্যত্র কৌটিল্য স্পষ্ট করেই বলেছেন যে যেখানেই 'ব্যবহার' (দণ্ডনীতি) ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে সেইখানেই ধর্মকে মেনে চলতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্যও এই একই কথাই বলেছেন। অতএব দণ্ডনীতি যে ধর্মশাস্ত্রের থেকে অনেক বেশী হীনমর্যাদাসম্পন্ন ছিল তা অনস্বীকার্য।

৮৭। উপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি দাঁড়াল তা হল এই : দণ্ডনীতি বা রাজধর্ম ধর্মশাস্ত্রের মতই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকে কখনই অতিক্রম করতে পারেনি। ধর্ম হল জীবনের ব্যঞ্জনা, আর দণ্ড হল রাষ্ট্রের। মানুষ যে রাষ্ট্র গড়েছে তার মূল নিহিত হয়েছিল ধর্মের মধ্যে যার উৎস হল বেদ। বেদ তর্কের অতিশায়ী। তাই ধর্ম যখন তর্কাতীত, দণ্ড তখন তর্কাধীন। অথচ এই তর্কাধীন বিদ্যা রচিত হয়েছিল বাঙ্মানসের অগোচর তর্কাতীত ব্রহ্মার হাতে। তা কেমন করে হল প্রাচীন ভারতীয়রা তার ব্যাখ্যা করেননি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব

৮৮। প্রাচীন ভারতে ধর্ম, কর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত তিনটি অত্যন্ত সংযুক্ত বিষয়রূপে গড়ে উঠেছিল। মূল বিষয় ছিল কর্ম; ধর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত তারই অনুসঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐহিক কর্মের পরিণাম জন্মান্তরে প্রতিফলিত হয়। অতএব ঐহিক কর্মের সুচারু অনুষ্ঠান হল ধর্ম। কিন্তু কখনও যদি সেই অনুষ্ঠানে বৈগুণ্য আসে, দেখা যায় বৈকল্য, তবে কী হবে? মানুষকে কি জন্মান্তরে কষ্ট পেতে হবে তার ইহলোকের ব্যর্থতার জন্য? এই ব্যর্থতার প্রতিষেধক ক্রিয়াই হল প্রায়শ্চিত্ত। অতএব প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ঐহিক ব্যর্থতা থেকে মুক্তি দেওয়া। তাই জাবালস্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্তকে 'কল্যাণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] সৎ কর্ম হল ধর্ম, অসৎ কর্মের পরিণাম পাপ।[৬০] প্রায়শ্চিত্ত হল পাপক্ষয়ের বিধিসম্মত ক্রিয়া।[৬১] কর্মের সার্থক অনুষ্ঠানে বৈকল্য আসে দু'রকমভাবে, অজ্ঞতা থেকে আর ইচ্ছাকৃত ভ্রষ্টাচার থেকে। সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে ক্রিয়ার প্রভেদ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত। কিন্তু সজ্ঞানে ঘটুক আর অজ্ঞানে ঘটুক, ক্রিয়ার একটি পরিণাম

৫৯. 'কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তম'—প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

৬০. 'Papa in any of its forms implies a violation of the principle of equilibrium existing in the nature of man. The violation has usually its origin in will and ignorance and in some cases may be unconscious. The defect which ensues, disturbs the purity of man in his mental, physical and social aspects. The scriptures lay down rules for expiation of all offences committed'—*The Theory of Karman in Indian Thought* by Koshelya Walli, Bharata Manisha, Varanasi, 1977, p. 23

৬১. 'An Indian Scholar [Kane, *History of Dharma Sastra* Vol. IV. p. 1] has tried to define 'Sin' as an act of wilful rebellion against or disobedience of some law supposed to be laid down by God or Revelation. It is opposition to the will of God manifested in an authoritative work or at least failure to abide by the regulation contained therein'—ibid, p. 24.

আছে। তাকে আমরা বলি কর্মফল। এই কর্মফল থেকে মুক্তি পাবার জন্য দরকার হয় চিত্তশুদ্ধি বা তপস্যা। এই চিত্তশুদ্ধিই হল প্রায়শ্চিত্ত। 'প্রায়ঃ' কথার অর্থ হল 'তপঃ' বা তপস্যা, আর 'চিত্ত' শব্দটির অর্থ হল 'নিশ্চয়', অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বা প্রত্যয়।[৬২] শূলপানির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' নামক পুরাণে স্মৃতিকর্তা হারীত মুনি বলেছেন যে মানুষের জীবনে অশুভজনিত অশুভভাবের সঞ্চয়কে বিনষ্ট করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। এই অশুভভাবের সঞ্চয় হয় কি করে? এই প্রশ্নের একটিই উত্তর আছে, আর সেটি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর। যা বিহিত তা যদি জীবনে ঠিকমত অনুষ্ঠিত না হয়, এবং যা নিন্দিত শুধুমাত্র যদি তাকেই সেবন করা হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কোন সংযম না হয়ে যদি শুধু তার চর্চাই চলতে থাকে তবে মানুষের জীবনে পতন আসে।[৬৩] এক কথায় জীবনে যদি সৎ-এর অনুষ্ঠান ও অসৎ-এর অধিষ্ঠান ঘটে তবেই অধর্মের সূচনা হয় এবং পাপের সঞ্চয় ঘটতে থাকে। তাই বলা হয় প্রতিদিন বল্মীকের সঞ্চয় ও অঞ্জনের ক্ষয় এই দুই দৃষ্টান্তকে চোখের সামনে রেখে মানুষ যেন দান, অধ্যয়ন ইত্যাদি কর্মের দ্বারা নিজের প্রাত্যহিক জীবনকে অতিবাহিত করে।[৬৪]

৮৯। প্রায়শ্চিত্তের দুটি দিক আছে, একটি আন্তর অনুষ্ঠান, আরেকটি বাহ্য অনুষ্ঠান। আন্তব অনুষ্ঠান হল মাসিক প্রায়শ্চিত্তসম্পাদন। কৃতকর্মের জন্য 'অনুতাপ' বা পশ্চাত্তাপ হল এর উপায়। মনুসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, প্রায়শ্চিত্তবিবেক ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে অনুতাপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে অনুতাপের সঙ্গে যদি প্রাণায়াম করা যায় তবে পরিপূর্ণ চিত্তশুদ্ধির ফল লাভ করা যাবে। অনুতাপের মাধ্যমে দু'রকম শুদ্ধির কথা মনু বলেছেন : (এক) অনুতাপের ফলে পাপ থেকে মুক্তি অর্থাৎ পাপের পরিণাম থেকে অব্যাহতি, এবং (দুই) ভবিষ্যতে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার সঙ্কল্পজনিত পবিত্রতা। পশ্চাত্তাপ, স্নান ও নিবৃত্তি, এই তিন ক্রিয়ার দ্বারা পাপের সংশোধন হয় একথাও শাস্ত্রে বলা আছে।[৬৫] পশ্চাত্তাপ ও নিবৃত্তি মনুকথিত দু'রকমের শুদ্ধি। এ-দুটি হল প্রায়শ্চিত্তের আন্তর অনুষ্ঠান এবং স্নান হল বাহ্য অনুষ্ঠান। মনে রাখা দরকার যে এখানে অনুতাপ ও নিবৃত্তির দ্বারা কর্মফল ভোগ, বা সেই ভোগ থেকে পরিপূর্ণ বা আংশিক নিষ্কৃতি, এই দুই ঘটনার কোনটি সূচিত

৬২. প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপো নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্ ।।—প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

৬৩. বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ।।—ঐ

৬৪. অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্টা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্যাদ্দানাধ্যয়নকর্মভি ।।—ঐ

৬৫. পশ্চাত্তাপনিবৃত্তিশ্চ স্নানঞ্চাঙ্গত্রয়োদিতম্—অঙ্গিরস্মৃতি।

হচ্ছে বলা কঠিন। কর্মফল অমোঘ, তাকে মোচন করা যায় না, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ' প্রভৃতি কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনুতাপ ও নিবৃত্তি প্রায়শ্চিত্ত নয়, প্রায়শ্চিত্তের সুচারু অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত মাত্র। এগুলি প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ, কিন্তু এদের অনুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণ সমাপন ঘটে না।

৯০। মানুষের দুষ্কৃতিজনিত পাপ মানুষের স্বীকারোক্তির (Confession) মধ্য দিয়ে ক্ষয় পায়। New Testament-এ এ-কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : 'Even so, I tell you, there will be more joy in Heaven over one sinner who, repents than over ninety righteous persons who need no repentance' (Luke 15) অথবা, 'Even so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents' (The New Testament, Thomas Nelson and Sons, New York). কনফেশন বা স্বীকারোক্তির কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও বলা হয়েছে।[৬৬] শতপথ ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে যে মানুষ যদি তার দুষ্কৃতির কথা স্বীকার করে তাহলে তার পাপের ভার কমে যায়। আগেকার দিনে অগ্নিকে সাক্ষী মেনে এবং পুরোহিতের সামনে দোষ স্বীকার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে বেদপাঠ ও গায়ত্রীমন্ত্র জপও[৬৭] পাপক্ষয়ের নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ত।

৯১। প্রায়শ্চিত্তের বাহ্য অনুষ্ঠানের কতগুলি প্রক্রিয়া আছে। এর মধ্যে একটি হল উপবাস। ঋষি গৌতম উপবাসকে পাপমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে উপবাস তপস্যার অন্তর্ভুক্ত। উপবাস ছাড়া প্রাণায়াম, হঠযোগচর্চা (সাধারণত একে আমরা যৌগিক ব্যায়াম বলি), ব্রহ্মচর্যপালন, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে নিবৃত হওয়ার চেষ্টা, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন, যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন, দান, ধ্যান, অধ্যয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর ও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের কথাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

৬৬. 'Regarding confession we read in the Apastamba Dharma Sutra that guilty person has to disclose his misdeeds with begging for alms to support himself. The guilt here is that of an Abhisasta, unjustly forsaking one's wife or murder of a learned Brahmana. In case of a Brahmacarin having his sex intercourse he was to confess his guilt while begging at some house'—Koshalya Walli, *op. cit.*, p. 26. —এটি গৌতম ধর্মসূত্রের মত।

৬৭. গায়ত্রীমন্ত্র হল হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র বা বীজমন্ত্র। প্রত্যেক ধর্মেই এরকম একটি বীজমন্ত্র আছে। ইসলাম ধর্মে এটি হল 'কলমা' (Kalma); শিখধর্মের বীজমন্ত্র হল 'সত্তিনাম' (এক ওঙ্কার সত্তি গুরু প্রসাদী ইত্যাদি)।

দ্রষ্টব্য : Gurbachan Singh Talib, *Japuji : The Immortal Prayer-chant*, Munshiram Manoharlal, 1977.

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভক্তিযোগ-অধ্যায়ে (১২শ অধ্যায়ে) অর্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অভিনিবেশ, অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যেমন,

অভিনিবেশ : 'আমাতেই তুমি (অর্জুন) মন সমাহিত কর,[৬৮] আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর।' ১২শ-৮

'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।'

অভ্যাস : যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করার চেষ্টা কর। ১২শ-৯

'অথ চিত্তং সমধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।'

'যদি তুমি এইভাবে অভ্যাস করতে সমর্থ না হও, তবে তুমি আমার জন্য কাজ কর (অর্থাৎ সুকৃতির সন্ধান কর)।' ১২শ-১০

'অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মানি কুবর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।'

জ্ঞান ও ধ্যান : 'অভ্যাস থেকে বড় হল জ্ঞান, জ্ঞান থেকে বড় ধ্যান।' ১২শ-১২

'শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরম্।।'

৬৮. 'কেনাপ্যুপায়েন রাজন্, মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'—ভাগবত ৭/১ /৩১ : নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'রাজন্, যে কোন উপায়ে হোক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা উচিত।'

'যে তু সবর্বানি, কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।'

—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, ১২শ, ৬-৭

'যারা সমস্ত কর্ম (অর্থাৎ কর্মের ফল) আমাকে দান করে, একমাত্র আমাতেই লক্ষ্য স্থির করে, একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাদের অল্পকালের মধ্যেই (জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনযুক্ত) সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করি।' গীতায় 'মৎকর্ম্মপরমো ভব', এই কথাটি রয়েছে, 'মৎকর্ম্ম' বলতে। বোঝায় ভগবৎ প্রীতিকর কর্ম যার অর্থ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ করেছেন 'একাদশী, উপবাস, ব্রতচর্যা, পূজা ও ইষ্টনাম জপাদি কর্ম', শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, পুর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৭৮।

৯২। বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়, আর তার থেকে আসে বৃহত্তর জীবনবোধে উত্তরণ। এইভাবে মানুষ তার কৃতকর্মের দোষ থেকে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করে। হিন্দুধর্ম, কর্ম ও কর্মবৈকল্যজনিত পাপবোধ সম্বন্ধে খুব সজাগ ছিল। পাপ শুধু আত্মিক অবক্ষয়ের ফলে দেখা দেয় একথা ঠিক নয়। বাহ্যিক কর্মে ত্রুটি ঘটলেও পাপের সঞ্চার হয়। বর্ণ, ধর্ম, বয়স, পরিবেশ, সঙ্গ, অনুষঙ্গ ও ঘটনা—এ সমস্ত কিছুর উপরে পাপ-পুণ্য নির্ভর করে। সঙ্গ (অর্থাৎ সংসর্গ) ও সঙ্গম (অর্থাৎ স্পর্শ) এই দুই-এর মধ্য দিয়ে পাপের সঞ্চার হয়। দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে এক যান বা বাহনে গমন, এক আসন গ্রহণ, এক শয্যায় শয়ন, এক আচ্ছাদনের ব্যবহার, এক পংক্তিতে উপবেশন ও ভোজন, এক স্থানে ও এক সংসর্গে পঠন-পাঠন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পাপের সঞ্চার হয়। বৃহস্পতি স্মৃতিতে এই রকম ক্রিয়াবৈকল্যজনিত নয়টি বৈগুণ্যের কথা বলা হয়েছে :

১. একশয্যা : এক বিছানায় শোয়া
২. একাসনম্ : এক আসনে উপবেশন
৩. একপংক্তি : পাপীর সঙ্গে বসে এক পংক্তিতে আহার
৪. ভাণ্ডমিশ্রান্নম্ : একই ভাণ্ডে অন্নপাক
৫. পক্কানমিশ্রান্নম্ : পাপী যে অন্ন পাক করেছে তার আহার
৬. যাজন : পাপীর গৃহে পুরোহিত হওয়া বা পূজার্চনা করা
৭. অধ্যাপন : পাপীর গৃহে শিক্ষক হওয়া, বেদপাঠ ইত্যাদি করা অথবা, পাপীর গৃহে কোন রকম অধ্যয়ন করা, বা পাপীকে অধ্যাপক বা বেদশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করা
৮. যোনিঃ : পাপীতে উপগত হওয়া বা পাপীর সঙ্গে দেহসংযোগ করা
৯. সহভোজন : পাপীর সঙ্গে বসে একই পাত্রের থেকে অন্নগ্রহণ

৯৩। মানুষের সংসর্গে মানুষের পাপবৃদ্ধি হওয়ার কথা পরাশরস্মৃতিতে (দ্বাদশ-৭৯) বলা হয়েছে। এগুলি আর কিছুই নয়, মানুষকে তার গৃহ, কর্ম, সঙ্গ ও অনুষঙ্গে স্থির রাখার নিয়ম। ভ্রষ্টাচারের পরিবর্তে সদাচার, আসক্তির বদলে নিবৃত্তি, বিলাসের স্থলে সংযম ও উন্মার্গগামিতার স্থলে সন্মার্গগামিতার অনুশীলনের জন্য কতগুলি সাধারণ নিয়ম মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। এ-পর্যন্ত পাপতত্ত্বকে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায় বা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এর বাইরে আরও অনেক কথা পাপতত্ত্বে বলা হয়েছে যা অর্থবহ নয়। যেমন বলা হয়েছে পাপের গভীরতা এক একটি যুগে এক এক রকম ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কৃতযুগে পাপ বৃদ্ধি হয় পতিতের সঙ্গে কথা বললে, ত্রেতাযুগে তাকে স্পর্শ করলে, দ্বাপরযুগে তার গৃহে অন্নগ্রহণ করলে। কলিযুগে সরাসরি পাপ কাজ করলে পাপ বৃদ্ধি হয়। পতিতের সঙ্গে কথা বললে পাপ বৃদ্ধি হয় একথা বৃহস্পতিস্মৃতির উপরে উল্লিখিত তালিকায় নেই। হিন্দুশাস্ত্রে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগকে যে দার্শনিক

অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে উপরের পাপতত্ত্বকে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন। চারটি যুগের প্রকৃত অর্থ এইরকম : নিদ্রাগত হওয়াই হল কলিযুগ, জাগ্রত হলেই দ্বাপর, দণ্ডায়মান হলেই ত্রেতা, অগ্রসর হওয়াই সত্যযুগ— অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও (চরৈবেতি, চরৈবেতি)।[৬৯] আরও বলা হয়েছে, পথ অতিক্রম করাই হল অমৃতলাভ, এগিয়ে যাওয়াই হল তার স্বাদু ফললো, চেয়ে দেখো, ঐ আলোকসম্পদময় সূর্যের দিকে, যিনি সৃষ্টির আদি থেকে চলতে চলতে একদিনের জন্যও নিদ্রিত হননি, বিশ্রামের জন্য থামেননি। অতএব অগ্রসর হও, ক্রমাগত অগ্রসর হতেই থাকো।[৭০] হিন্দুশাস্ত্রে যুগভেদের তত্ত্ব হল অগ্রসর হবার তত্ত্ব চলমানতার তত্ত্ব। তার সঙ্গে পাপতত্ত্বকে মেলানো বড় কঠিন।

৯৪। ভারতের পাপতত্ত্বকে কোন দার্শনিক তত্ত্বরূপে দেখলে ভুল করা হবে। ব্যক্তিপর্যায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক সুস্থিতিকে ধরে রাখার নিয়ম পাপতত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কোন পূর্বাচার্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে সমাজে পাঁচরকমের পাপী আছে : যারা স্বর্ণ অপহরণ করে, সুরা পান করে, গুরুর শয্যা কলঙ্কিত করে, ব্রাহ্মণকে হত্যা করে এবং এই চারধরনের পাপকার্যে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সঙ্গে যারা সংযোগ রক্ষা করে তারা হল সমাজের পাঁচ ধরনের পাপী। চুরি, নেশা, অবৈধ প্রণয় ও হত্যা, এই চাররকম কাজই যে নৈতিক অর্থে নিন্দনীয় এবং সামাজিক অর্থে গর্হিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের গর্হিত কাজকে শাস্তি দেবার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন রয়েছে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের দর্শনটি আইনের দর্শন থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারগণ মনে করতেন যে অপরাধকারী মানুষের শাস্তিদাতা প্রাথমিক পর্যায়ে সেই মানুষ নিজেই। তারপরে সমাজ বা রাষ্ট্র। অতএব ব্যক্তিমানুষের বিবেককে এমনভাবে জাগ্রত করতে হবে যে তার কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া প্রথমে আলোড়িত হবে তার মর্মলোকে, তারপরে বাইরের সমাজে। দণ্ডনীতি বাইরের সমাজের শাসন প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির অন্তর্লোকের নিজস্ব শাসন। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত অপরাধই না সংঘটিত হয়। সমাজ তার কতটুকু খোঁজ রাখে। গোপন ব্যভিচারের গ্লানিতে সমাজ যাতে আচ্ছন্ন না হয় তাই ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্বের উপর তার স্বায়ত্তশাসন হিন্দুধর্ম স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রায়শ্চিত্ত হল যুগপৎভাবে এই স্বায়ত্তশাসনের আইন ও দর্শন।

৬৯. কলি শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরণ্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

৭০. চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদু মৃদুস্বরম্।
সূর্যাস্য পশ্য শ্রেমাণাং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি॥

৯৫। দুষ্কর্মের পরিণাম হল পাপ, আর পাপ থেকে মুক্তির উপায় হল প্রায়শ্চিত্ত। পাপের গভীরতা ক্রিয়াবিশেষে ভিন্ন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র পাপকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে, একটি 'পতনীয়', আরেকটি 'অশুচিকর', যে কাজ মানুষের নৈতিক এবং অবশেষে সামাজিক পতন ঘটায়, তার পরিণাম পতনীয় পাপ। যে কাজ সামাজিক পতন না ঘটালেও ব্যক্তিগত মালিন্যকে সূচিত করে তার ফল হল অশুচিকর পাপ। বর্ণনাশ, অর্থাৎ সহজভাষায় আমরা যাকে বলি জাত যাওয়া, তাই হল সামাজিক অর্থে অবনমনের প্রধান চিহ্ন। ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইখানে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের সঙ্গে বর্ণের অনুশাসনকে পরোক্ষভাবে যুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, যে ব্যক্তিগত শুচিতার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে তা শারীরিক ও মানসিক উভয়দিকের শুচিতা। গুরুর শয্যা কলঙ্কিত করলে শারীরিক শুচিতা নষ্ট হয়, চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করলে নষ্ট হয় মানসিক শুচিতা। তাই ব্যক্তিগত শুচিতা রক্ষার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই প্রচেষ্টা। পাপ কোন পর্যায়ে অশুচিকর, এবং কোন পর্যায়ে তা গাঢ় হয়ে পতনীয় হয় তা নিয়ে শাস্ত্রকাররা মাথা ঘামাননি। অন্তত এই দুই পর্যায়ের কোন গাণিতিক বিভাজন হয় না। তাই সকলেই যে পাপকে এই দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন তা নয়। বৌধায়ন বলেছেন পাপ তিন রকমের, পতনীয়, উপপাতক ও অশুচিকর। বশিষ্ঠও পাপকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, এনঃ (এনস্), মহাপাতক ও উপপাতক। কাত্যায়ন-এর মতানুসারে পাপ পাঁচ রকম, একথা মিতাক্ষরার টীকায় বলা আছে, আর তা হল মহাপাপ, অতিপাপ, পাতক, প্রাসঙ্গিক ও উপপাপ।[৭১] বিষ্ণুধর্মসূত্রেও পাপকে নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৯৬। শাস্ত্রকাররা পাপকে যত ভাগেই ভাগ করুন না কেন, পাপ মূলত দু'রকমের। ইচ্ছাকৃত পাপ ও অনিচ্ছাকৃত পাপ। কোন কোন শাস্ত্রকার মনে করেন প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছাকৃত পাপের মোচন ঘটাতে পারে না। অনিচ্ছাকৃত পাপের দায় থেকে মুক্ত করাই হল প্রায়শ্চিত্তের কাজ। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য একথা স্পষ্ট করে লিখেছেন। সুগভীর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ইচ্ছাকৃত পাপের খণ্ডনের কথাও অবশ্য মনু বলেছেন। স্মৃতিকাররা সাধারণভাবে মনে করেন যে পাপী মানুষ সমাজে মেলামেশা করার উপযুক্ত নয়। প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে সে সমাজে মেশার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। ইচ্ছাকৃত পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত শুধু এইটুকুই দিতে পারে। নরকভোগের যন্ত্রণা থেকে কখনই মুক্ত করতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তকে বিধি অনুসারে পালন করতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত নিজের থেকেই অনুষ্ঠিত হয় না। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে ইন্দ্র একদা কয়েকজন

৭১. মহাপাপং চাতিপাপং তথা পাতকমেব চ।
প্রাসঙ্গিকং চোপপাপমিত্যেবং পঞ্চকো গণ ইতি॥

'যতি'-কে[৭২] শালাবৃকের[৭৩] সামনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে উপহব্য নামক প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করতে হয়েছিল। স্বেচ্ছায় পাপকাজে লিপ্ত হলে পাপের ফল দ্বিগুণ হয়, এটি অঙ্গিরা-র কথা। একথার অন্তরালে একটি অনুশাসন রয়েছে : মানুষ যেন স্বেচ্ছায় পাপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি লিপ্ত হয়? তবে অনিবার্যভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কি প্রায়শ্চিত্ত? অঘমর্ষণ। অঘমর্ষণ একটি পাপনাশন মন্ত্র। জলে অবগাহন করে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়। বিধি অনুযায়ী এই মন্ত্রপাঠ করতে হবে দিনে তিনবার। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর স্নান করলে যে-ফল পাওয়া যায়, এই মন্ত্রপাঠের ফলও নাকি তাই। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে ক্রমাগত তিনদিন এই মন্ত্রপাঠ করতে হবে। অঘমর্ষণ আসলে একটি ব্রত। প্রায়শ্চিত্তসার গ্রন্থের অনুশাসন হল যে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হলে তিনদিন উপবাস করতে হবে। দিনে দণ্ডায়মান থেকে এবং রাত্রে উপবেশন করে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। অঘমর্ষণ একটি প্রায়শ্চিত্তের বিধি এবং পাপীই তা পালন করেন। তাই এই নিয়ম এত কঠোর। ব্রতপালনের শেষ পর্বে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করতে হয়।

৯৭। অঘমর্ষণ ছাড়া নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের কথাও শাস্ত্রে বলা আছে। কোন কোন কৃচ্ছ্র আছে যা সারাবছর পালন করতে হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থে এধরনের কৃচ্ছ্রসাধনকে কৃচ্ছ্র-সম্বৎসর বলা হয়েছে। স্বল্পকালের একটি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের নাম হল অতিকৃচ্ছ্র। এটি ন্যূনপক্ষে একটানা বারোদিনের ব্রত। এই ব্রতের মূল বিধি হল স্বল্পাহার। প্রথম তিনদিন সকালে, দ্বিতীয় তিনদিন বিকালে স্বল্পাহার গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় তিনদিনের যে আহার তাও হবে অনুরূপভাবে স্বল্প এবং তা কারো কাছে চাওয়া বা ভিক্ষা করা যাবে না। চতুর্থ তিনদিন উপবাস করতে হবে। অতিকৃচ্ছ্রের এই বিধি দিয়েছেন মনু। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে-ও মনুর মতের সমর্থন রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন অতিকৃচ্ছ্রের আহার হবে স্বল্প এবং এক মুষ্ঠির মধ্যে যা ধরে তাই আহার করতে হবে। মনু বলেছেন অতিকৃচ্ছ্র ব্রাহ্মণহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার প্রায়শ্চিত্ত। গৌতমস্মৃতি-তে বলা হয়েছে যে অতিকৃচ্ছ্র ব্রতে মহাপাতক ছাড়া সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

৯৮। অতিকৃচ্ছ্র ধরনের আরেকটি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হল কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। এখানেও মূল বিধি হল স্বল্পাহার। গৌতমস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র আহারের দিনগুলিতেই জলপান করা যাবে। অর্থাৎ বিকল্পে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু দিন অনাহারে থাকতে হবে, অর্থাৎ উপবাস করতে হবে, আর তা হবে নিরম্বু উপবাস। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে

৭২. যতি-পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী, বিধবা।
৭৩. শালাবৃক : কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, মৃগ, বানর।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র সাধনে একুশ দিন শুধু দুগ্ধপান করে থাকতে হবে। মনু বলেছেন যে ব্রাহ্মণকে লাঠি দিয়ে মারলে যদি রক্তপাত ঘটে তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র।

৯৯। খুব কঠোর একটি কৃচ্ছ্রের নাম হল গোমূত্রকৃচ্ছ্র।[৭৪] এই কৃচ্ছ্রের বিধি প্রায়শ্চিত্তসার গ্রন্থে বলা আছে। একটি গাভীর খাদ্যে গম ও যব মিশ্রিত করে তাকে খাওয়াতে হবে। এত খাদ্য দিতে হবে যাতে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। তারপর তার গোময় থেকে সেই যবগুলিকে তুলে নিয়ে তাকে পরিশ্রুত করতে হবে। সেই যবকে গোমূত্র-সহযোগে পাক করে ভক্ষণ করতে হবে।

১০০। দ্বাদশদিনের একটি কৃচ্ছ্রের নাম হল আগ্নেয়কৃচ্ছ্র। এই কৃচ্ছ্রে দ্বাদশদিন তিল[৭৫] ভক্ষণ করতে হবে।

১০১। একটি লঘুকৃচ্ছ্রের নাম হল অর্ধকৃচ্ছ্র। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে এই কৃচ্ছ্রের বিধি হল একদিন শুধু দিনের বেলায় একবার ও একদিন শুধু রাত্রে একবার আহার করা যাবে। পরের দু'দিনের আহার কারোও কাছে যাচঞা না করে জোগাড় করতে হবে। তার পরের দু'দিন উপবাস করতে হবে।

১০২। একটি তপ্ত আহারের কৃচ্ছ্র হল তপ্তকৃচ্ছ্র। মনুস্মৃতি অনুযায়ী তপ্তকৃচ্ছ্রে ব্রতী ব্রাহ্মণ প্রথম তিনদিন শুধু উষ্ণ জল পান করবেন, পরের তিনদিন পান করবে শুধু উষ্ণ দুধ। এর সঙ্গে স্নান করা যাবে প্রত্যহ মাত্র একবার। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তপ্তকৃচ্ছ্র চারদিনের ব্রত, প্রথম দিন পান করতে হবে শুধু উষ্ণ দুধ, দ্বিতীয় দিন উষ্ণ ঘি, তৃতীয় দিন উষ্ণ জল এবং চতুর্থ দিন উপবাস। ব্রহ্মপুরাণ, অত্রিস্মৃতি ও পরাশরস্মৃতিতে এইসব পানীয়ের পরিমাণ বলে দেওয়া আছে, উষ্ণ জল ছয় পল, উষ্ণ দুধ তিন পল এবং উষ্ণ ঘি এক পল।[৭৬] ব্রপুরাণে আরও বলা আছে যে উষ্ণ জল, দুধ ও ঘি পান করতে হবে যথাক্রমে সন্ধ্যায়, সকালে ও দ্বিপ্রহরে।

১০৩। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে তুলাপুরুষকৃচ্ছ্র বলে একটি ব্রতের উল্লেখ আছে। এই ব্রতে আহারের নিয়ম এইরকম : প্রথম তিনদিন তিলকল্ক, এবং তারপরে যথাক্রমে তিনদিন ভাতের ফেন, তিনদিন মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল, তিনদিন যব ও তিনদিন জল। অত্রিস্মৃতিতেও এই একই কথা বলা আছে। সাংখ্যস্মৃতির বিধান কিছুটা অন্যরকম,

৭৪. গোমূত্র আয়ুর্বেদে স্বীকৃত একটি রক্তশোধক ওষুধ, গোমূত্র পান করলে বা লেপন করলে যে কোন চর্মরোগ থেকে আরোগ্যলাভ করা যায়। এটি সোরা বিষনাশক (anti-psoric) ওষুধ।

৭৫. শ্বেততিল শরীরের পিত্ত নামক অগ্নিরসকে সহজ রাখে।

৭৬. পল : কর্ষচতুষ্টয়রূপ পরিমাণ-বিশেষ সূক্ষ্মকাল বিশেষ, মাংস।

তিলকল্ক, ফেন, মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল, জল ও যব—এর প্রত্যেকটি একদিন করে খেতে হবে। শেষদিন উপবাস, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুযায়ী এই প্রায়শ্চিত্ত এক পক্ষকালের, সাংখ্যস্মৃতি অনুযায়ী ছয়দিনের।

১০৪। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ছয়দিনের যে প্রায়শ্চিত্ত তাকে বলা হয়েছে সৌম্যকৃচ্ছ্র। এই কৃচ্ছ্রে প্রথম পাঁচদিন থেকে হবে যথাক্রমে শুধুমাত্র তিলকল্ক, ভাতের ফেন, মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল, জল ও সক্তু।[৭৭] শেষদিন উপবাস।

১০৫। সান্তপন নামে আরও একটি প্রায়শ্চিত্তের কথা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন ও অত্রি স্মৃতি-তে বলা হয়েছে। এটি হল দুইদিনের প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দিনের ভোজ্য হল গোমূত্র, গোময়, দই, দুধ, ঘি এবং কুশের জল। দ্বিতীয় দিন পরিপূর্ণ উপবাস। মহাসান্তপন নামে একটি প্রায়শ্চিত্তের কথা যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন ও অত্রিস্মৃতিতে বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও অত্রিস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে এই প্রায়শ্চিত্ত সাতদিনের। বৌধায়নস্মৃতি অনুযায়ী এই প্রায়শ্চিত্ত একুশ দিনের। মহাসান্তপন প্রায়শ্চিত্তে গোমূত্র, গোময়, দই, দুধ, ঘি এবং কুশের জল—এইগুলির প্রত্যেকটি একদিন করে খেতে বা পান করতে হবে।

১০৬। ব্রহ্মকূর্চ নামে আরেকটি প্রায়শ্চিত্তের অর্থ হল দুইদিনের ব্রত। প্রথম দিন সম্পূর্ণ উপবাস এবং দ্বিতীয় দিন বৈদিক মন্ত্রের সহযোগে পঞ্চ গব্য ভক্ষণ। পঞ্চ গব্য হল গোমূত্র, গোময়, দই, দুধ, ঘি ও কুশের জল। এটি সাংখ্যস্মৃতির বিধান। পঞ্চ গব্য আহারের সময় কোনটির সঙ্গে কি মন্ত্রপাঠ করতে হবে তাও শাস্ত্রে বলা আছে।[৭৮] যেমন গোমূত্র পানের সময় গায়ত্রী মন্ত্র, গোময়ের সঙ্গে গন্ধদ্বার, দুধের সঙ্গে আপ্যায়স্ব, দই-এর সঙ্গে দধিক্রাব্ন, ঘি-এর সঙ্গে তেজোসি, কুশের জলের সঙ্গে দেবস্য ত্বা। জাবালস্মৃতির নির্দেশ কিছুটা অন্যরকম; প্রায়শ্চিত্তবিবেক-এ তার উল্লেখ আছে। এই

৭৭. সক্তু : Coursely ground meal, grit, groats (esp of barley-meal)—Sir Monier *Monier Williams*, যবের ছাতু।
পিণ্যাক : Sesamum oil-cake, saffron, তিলকল্ক, জাপরান—*Trilingual Dictionary, oil-cake—Monier-Williams,* তেল-নিষ্কাশিত তিল।

৭৮. গায়ত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
আপ্যায়স্বেতি বৈ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি॥
তেজোঽসীতি ঘৃতঞ্চৈব দেবস্য ত্বা কুশোদকম্।
গোমূত্রভাগস্তস্যার্দ্ধং শকৃৎ ক্ষীরস্য চ ত্রয়ম্॥
দ্বয়ং দধ্নো ঘৃতস্যৈকমেকঞ্চ কুশবারিণঃ।
ব্রহ্মকূর্চমিদং নাম ব্রতং সর্বাঘসূদনম্॥

নির্দেশ অনুযায়ী একদিন, বিশেষ করে পূর্ণিমার দিন, পরিপূর্ণ উপবাস, পরের দিন প্রত্যুষে পঞ্চ গব্য ভক্ষণ।[৭৯]

১০৭। একটি সনাতন প্রায়শ্চিত্তের নাম চন্দ্রায়ণ। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী চন্দ্রায়ণ দুই রকমের, যবমধ্য এবং পিপীলিকামধ্য। প্রায়শ্চিত্তবিবেক-এ জাবালস্মৃতি-র উদ্ধৃতি বলা হয়েছে যে চন্দ্রায়ণ পাঁচ রকমের : যবমধ্য, পিপীলিকামধ্য, যতিচন্দ্রায়ণ, সর্বতোমুখ,[৮০] শিশুচন্দ্রায়ণ। চন্দ্রায়ণ সর্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে যখন কোন প্রায়শ্চিত্তের নাম উল্লেখ না করে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা থাকে, তখন ধরে নিতে হয় যে তা চন্দ্রায়ণ। যে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত চন্দ্রায়ণ। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রায়শ্চিত্ত এবং বৎসরাধিক কাল ধরেও তা করা যেতে পারে। স্বল্পকাল এই প্রায়শ্চিত্ত পালন করলেও পাপের মোচন ঘটে ; একবছর নিরবচ্ছিন্ন পালনে পুণ্যের সঞ্চয় হয়। গৌতমস্মৃতিতে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং চন্দ্রায়ণকে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি প্রায়শ্চিত্ত একসঙ্গে পালন করলে যে কোন গুরুপাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে পালন করলে লঘুপাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যবমধ্য চন্দ্রায়ণের নিয়ম এইরকম : শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একবারমাত্র সামান্য আহার গ্রহণ। আহারের পরিমাণ হবে একগ্রাস মাত্র। তারপরের প্রত্যেক তিথিতে একগ্রাস করে আহার বাড়াতে হবে। এইভাবে ঠিক পূর্ণিমা তিথিতে আহারের পরিমাণ হবে পনেরো গ্রাস। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে আহারের পরিমাণ হবে চৌদ্দ গ্রাস। তারপরে প্রত্যেক তিথিতে একগ্রাস করে কমাতে হবে। কৃষ্ণা চতুর্দশীতে আহারের পরিমাণ হবে একগ্রাস মাত্র। অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ উপবাস। এই প্রায়শ্চিত্তের নাম যবমধ্য, কারণ যবই হল প্রায়শ্চিত্তের সময়কার প্রধান খাদ্য এবং প্রায়শ্চিত্ত-সময়ের মধ্যভাগে, অর্থাৎ পূর্ণিমার সময়, আহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, এবং তার শুরু এবং শেষে আহারের পরিমাণ সবচেয়ে কম।

৭৯. অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ
পঞ্চ গব্যং পিবেৎ প্রাতর্ব্রহ্মকূর্চবধিঃ স্মৃতঃ।

৮০. সর্বতোমুখ : আকাশ, শিব, ব্রহ্মা, পরমেশ্বর, আত্মা, ব্রাহ্মণ, স্বর্গ, অগ্নি—*Trilingual Dictionary*।

১০৮। যবমধ্য প্রায়শ্চিত্তের বিপরীত হল পিপীলিকামধ্য প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্তে শুরুতে ও শেষে আহারের পরিমাণ বেশি এবং মধ্যভাগে কম, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পিপীলিকামধ্যব্রতের শুরু। প্রথম দিন চোদ্দ গ্রাস আহার হল বিধি। তারপরে একগ্রাস করে আহার কমবে। অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ উপবাস। তারপর প্রত্যেক তিথিতে একগ্রাস করে বাড়তে থাকবে। পূর্ণিমার দিন পনেরো গ্রাস আহার গ্রহণ করতে হবে।

১০৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রায়ণ হল আহারের নিয়ন্ত্রণের ব্রত। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে সারামাসে ২৪০ গ্রাস আহারই হল চন্দ্রায়ণব্রত। শুধু চন্দ্রায়ণ নয়, সমস্ত ব্রতেই আহারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চগব্য ভক্ষণ, উপবাস—তিথি অনুযায়ী সংযত আহার, এই সমস্তই প্রায়শ্চিত্তের অংশ। তা ছাড়া দান, ধ্যান, মন্ত্রজপ, প্রাণায়াম, অনুশোচনা, সত্যানুরাগ, অকপট স্বীকার (Confession), অশন-বসন-শয়ন—উপবেশন সম্বন্ধে সতর্কতা প্রাত্যহিক ব্যবহারে কৃচ্ছ্রসাধন, এই সবকিছু মিলিয়ে ভোগহীন আচরণ, সম্ভোগহীন জীবনচর্যাই হল প্রায়শ্চিত্ত। আচরণে সতর্কতা, জীবনবোধে সততা, জীবনচর্যার ঋজুতা, ইত্যাদি ছিল প্রায়শ্চিত্তব্রতের মূল কথা। প্রাচীন শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের কথা এসেছে আদেশ, উপদেশ, নির্দেশের রূপে। কখনো তা অনুশাসনের রূপ নিয়েছে। আদেশই হোক আর উপদেশই হোক, অনুশাসনই হোক আর নির্দেশই হোক, প্রায়শ্চিত্ত ছিল এক ব্যাপকভাবে পালনীয় অনুষ্ঠান। উপরে যে সব প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে তা সবই ব্যষ্টিজীবের পালনীয় অনুষ্ঠান, সমষ্টিজীবের পালনীয় নয়। বেদান্ত, পঞ্চ তন্ত্র ইত্যাদিতে সমষ্টির পালনীয় প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির কথা বলা আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত আসলে কতগুলি অনুসরণীয় নীতি, কতকগুলি ব্যবহারিক কর্তব্য, সমাজজীবনে আচরণীয় কতকগুলি রীতি। এগুলি ব্যষ্টির আত্মশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত নয়। ব্যষ্টিজীবের যেমন আছে অশন-বসনের নীতি, সমষ্টিজীবের সেইরকম আছে কর্মের নীতি, উদ্দেশ্যের নীতি, আত্ম-প্রয়োগের নীতি। এক কথায় এগুলি হল ধর্ম-অধর্মের নীতি। ব্যষ্টির জীবনচর্চা নয়, সেগুলি হল সমষ্টির জীবনচর্যা। ব্যষ্টিজীবের প্রায়শ্চিত্ত হল আত্মিকতার তন্ত্র, সমষ্টির ক্ষেত্রে তা হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের বীজমন্ত্রই হল পঞ্চ তন্ত্র ইত্যাদির মূল উপজীব্য বিষয়।

১১০। উপরে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অনুধাবন করলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যষ্টির প্রায়শ্চিত্ত আসলে দ্বিমুখী—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী, আত্মিক ও সামাজিক। বাহ্যিক শুচিতার সঙ্গে যেমন যুক্ত হয়ে আছে আত্মিক শোধন, তেমনি বাহ্যিক সংযমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে সামাজিক শিষ্টতা। শিষ্টতা লোকায়তের, শুচিতা লোকোত্তরের। ব্যষ্টি এই দুই-এর সংযোজক, তাই প্রায়শ্চিত্ত দ্বিমুখী। লোকায়তের সাধনার মধ্যে লোকোত্তরের সম্ভাবনা—এ-কথা প্রাচীন ভারত জানত। আর জানত বলেই

শোধন-শুচিতা, সংযম-শিষ্টতার প্রতি তার এই অতিশয় আসক্তি। দর্শনের এই সরল কথাটুকু বাদ দিলে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের পুরোটাই হয়ে পড়ে অসার। প্রায়শ্চিত্তের দর্শন যখন জীবনের বোধকে আশ্রয় করে তখনই জীবনদর্শনে প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য হয়, নচেৎ নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব ও ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ

অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরপর থেকে হিন্দুধর্ম বারবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কখনো সে চ্যালেঞ্জ এসেছে বাইরে থেকে, কখনো বা ভেতর থেকে। কিন্তু কোন চ্যালেঞ্জই পরিমাপ ও গভীরতায়, ব্যাপ্তি আর তীক্ষ্ণতায়, বৌদ্ধ ধর্ম আয়োজিত চ্যালেঞ্জের সমান ছিল না। এই চ্যালেঞ্জের দুটি দিক ছিল। একদিকে হিন্দুধর্মের আধিভৌতিক নৈতিক (metaphysical-moral) জীবনদর্শনকে অস্বীকার করার প্রবণতা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। যে মৌল অধ্যাত্মবোধের উপর হিন্দুধর্ম দাঁড়িয়েছিল তার বনিয়াদকে নতুন করে বুঝবার চেষ্টা করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম। অতএব এ আক্রমণ হিন্দুধর্মের মর্মস্থলে আঘাত হেনেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হল বহিরঙ্গের। সমাজজীবনে ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে অস্বীকার করে সেখানে সামান্য-জনের সর্বজনীন প্রভাবকে কায়েম করার আয়োজন করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম। এই আক্রমণ হিন্দুসমাজের গঠনতন্ত্রকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্ণব্যবস্থা ও জাতিব্যবস্থার স্থায়িত্ব এর দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে বহিরঙ্গের গঠনতন্ত্র ও অন্তর্পটের দর্শন—হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সবটুকুই নাড়া খেয়েছিল। এমন গভীর, ব্যাপক স্থির ও আত্মপ্রত্যয়শীল, আপাত শান্ত অথচ সর্বগ্রাসী চ্যালেঞ্জ হিন্দু সমাজ ও ধর্ম—এর আগে ও পরে কখনো দেখেনি। বৌদ্ধ ধর্মের সংগঠিত হওয়ার একটা দিক ছিল। শাক্যমুনি গৌতম নামক এক মানবিক বিন্দুকে কেন্দ্র করে, সমাজের মধ্যে অস্তিত্বশীল, জীবন্ত এক মানববিগ্রহকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ ধর্ম শক্তিলাভ করেছিল। জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, মার্কস, লেনিন, গান্ধীজী, নেতাজী, মাও-সে-তুং, হো-চি-মিন প্রমুখ ব্যক্তি মানুষেরা সমাজস্থিত মানবিক বিন্দু হিসাবে কি পরিমাণ শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন তা ইতিহাসের যে কোন পাঠক মাত্রই জানেন। গুরু নানক বা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও ইতিহাসে বড় মাপের প্রেরণার বিন্দু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। গৌতমও সেইরকম একটি মানবিক বিন্দু হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন যাকে ঘিরে প্রতিবাদের বৃত্ত রচিত হতে পারে, সামাজিক শক্তির পরিধি গড়ে উঠতে পারে,

স্খলিত সমাজব্যবস্থার সহস্র রন্ধ্র থেকে দলিত মানুষের আক্রোশ নিঃশেষে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত শক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যূহ রচনা করতে পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে হিন্দুধর্মের সংগঠিত করার এইরকম নিশ্চিত কোন মানবিক বিন্দু ছিল না যে বিন্দুকে ঘিরে প্রতিরোধের শক্ত দেয়াল গড়ে উঠতে পারে। তবে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম দেখিয়েছে যে প্রয়োজনের সময়ে সেও রুখে দাঁড়াতে পারে। শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ইতিহাসের সন্ধিমুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরাই হিন্দুরথের রশিকে বিপথগামিতার পথ থেকে উল্টোদিকে টেনে ধরেছিলেন। এর ফলে প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম, মধ্যযুগে ইসলাম এবং বর্তমানকালে খ্রিস্টধর্মের দুর্দমনীয় প্রভাব থেকে তাঁরা হিন্দুধর্মকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। মোটের উপর কথাটা হল এই যে গৌতমের আবির্ভাবের সময়ে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের প্রহরী কেউ ছিল না। হিন্দুধর্মের একটা বড় দুর্বলতা হল যে তার সৃষ্টির শুরু থেকে যে ধর্ম হল অপৌরুষেয়—ঈশ্বরের দান যা কোন মানবিক মাধ্যমের দ্বারা মর্ত্যলোকে প্রচলিত হল তা বলা নেই। বেদ সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রুত তাই তার নাম 'শ্রুতি'। কিন্তু অমর্ত্যের বিমূর্তবাণী কোন মর্ত্যচেতনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হল তা জানা যায় না। ফলে সূচনার মুহূর্ত থেকে হিন্দুধর্মের কোন মানবিক নেতৃত্ব নেই। এটি তার বড়মাপের দুর্বলতা। খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের সন্তান বলে যীশুকে তাদের চৈতন্যের অগ্রগামী পুরুষ করে রেখেছে, ইসলাম চিনে রেখেছে তাদের নবীকে আর বৌদ্ধ ধর্মত বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলে কোন এক শরীরী ও লোকায়ত সত্তার মধ্যে বিলীন হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম? তার উন্মেষ মুহূর্তের প্রণব ধবনি আছে, কিন্তু কোন প্রবুদ্ধ সত্তা নেই যে যীশুর মতো ত্যাগী, মহম্মদ রসুলের মতো সংগ্রামী কিংবা বুদ্ধের মতো জ্ঞানসমাহিত ধ্যানী। গৌতমের প্রবর্তিত ধর্মে তাই তৃপ্তি থেকে বিচ্ছেদ, সম্ভোগ থেকে বিশ্লেষণই হল মুক্তি। হিন্দুধর্ম জাগতিক বন্ধনকে বলেছে মায়া।[৮১] গৌতম বললেন, না— জাগতিক বন্ধন বড় বাস্তব, বড় প্রত্যক্ষ, বড় সত্য। এই বন্ধনকে অস্বীকার করাই হল উত্তরণ বা ট্রান্সেন্ডেন্স। এই উত্তরণ পরলোকে নয়, বারবারের চেষ্টায় ইহলোকেই ঘটাতে হবে। তাঁর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, তাঁর ধ্যানের মধ্য দিয়ে গৌতম এই উত্তরণের নকসাটি খুঁজে বার করেছিলেন।[৮২]

৮১. বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।। গীতা ।। ২।২২
(মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরে সেইরকম আত্মাও পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।)

৮২. "Buddhism, of course, was born out of the great unveiling of transcendence by Gautama, who through meditation reached the enlightened insight that

কষ্টের মধ্য দিয়ে কেষ্ট মেলে, যন্ত্রণার আগুনে পুড়লে ব্রহ্মতেজ জাগ্রত হয়, আত্মার শুদ্ধি ঘটে এ ধারণা ভুল। সমস্ত যন্ত্রণার উৎস হল আসক্তি। অতএব আসক্তির নিবারণই হল মুক্তির প্রধান উপায়। এইটিই বৌদ্ধ ধর্মের মূল বাণী।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে, যে কোন ধর্মকে বুঝতে হলে তিনটি জিনিসকে বোঝা দরকার—এক, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে প্রতিপালিত শুদ্ধাচার (piety) অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনাচারণের মধ্যে অনুক্ষণ অনুশীলিত নৈতিক পবিত্রতা; দুই, ধর্মের মুখোমুখি সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থান (polity) এবং তিন, ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ের মুখোমুখি কি মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করছে তার সম্বন্ধে সমাজমনস্কতা (policy)। বৌদ্ধ ধর্ম piety[৮৩] বা পবিত্রতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল।[৮৪] এখানে পবিত্রতার মূল কথা ছিল কঠিন আত্মনির্ভরতা। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের মতো করে আপন সাধনার দ্বারা সত্যকে খুঁজে বার করতে হবে, প্রয়োজন হলে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা করতে হবে। এখানে নিহিত আছে একের নিভৃত তপস্যার কথা, যূথবদ্ধতার মধ্য দিয়ে জীবনসঙ্গমের সাধনার কথা এখানে বলা নেই। অথচ সমাজ থেকে সরে আসলে নির্জনতার মধ্যেও সমষ্টিবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব গড়ে উঠল মঠের আদর্শ। মোনাস্টিক অর্ডার ও চার্চের (ভারতবর্ষে মঠতান্ত্রিকতা থাকলেও চার্চের ধারণা ছিল না)

the metaphysical moral vision of his Hindu predecessors was mistaken. Suffering in this world was neither a necessary part of the soul's pilgrimage to its home in the a cosmic oversoul, nor caused by disruption of the cosmic or caste order. These, in fact, are illusions; for the source of ill is attachment to these, and other things. At the deepest level, things (including, ultimately, *atman* and *brahman*) are not real. What is real, and of transcendent worth, in the Buddhist, view, is the knowledge of how enlightened release from these and other things may be found : by detachment".

The Encyclopaedia of Religion, Vol. 11, p. 423.

৮৩. Piety হল ধর্ম। ধর্ম অর্থে সদাচার—প্রতিদিনের পালনীয় শিষ্টবোধ ও কর্তব্য। মহামতি অশোক তাঁর লেখমালায় 'পোরাণা পোকাতি'র কথা বলেছেন। তা হল শিষ্ট জীবনপদ্ধতির সনাতন নিয়ম। Vincent Smith তাকে Law of Duty or 'piety' বলে বর্ণনা করেছেন।

The Oxford History of India, 3rd ed p. 129.

৮৪. "At first, Buddhism led to an intense piety of self help : It is held that each person must find out the truth alone, by withdrawal from the world. The idea led to the formation of monastic orders of those who left the world behind, and to the most sustained and consistent form of asceticism the world has see."

The encyclopaedia of Religion, Vol. 11. p. 421.

ধারণা প্রাচ্যের ধর্মগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত। ইসলাম ধর্মে এইরকম সমাজবিচ্যুত অথচ সমষ্টিবদ্ধ ধর্মাচরণের ভাব একেবারেই নেই। হিন্দুধর্মে শঙ্করাচার্য বা স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া এইরকম মঠাশ্রিত ধর্মচর্চার কথা বড় বেশি কেউ বলেননি।

বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব এইখানে। তা লোকজীবনের বাইরে মঠাশ্রিত, মঠাশ্রিত হয়েও একক সাধনায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্ম একক সাধনার মধ্য দিয়ে উত্তরণ প্রয়াসী। একের সঙ্গে একের ব্যবধান ও সেই ব্যবধানজনিত বৈচিত্র্য যেমন অপরিসীম সেইরকম একক সাধনার মধ্য দিয়ে সত্যের মধ্যে উত্তরণও বিচিত্র।[৮৫] সমাজবিচ্যুত সমষ্টিবদ্ধ তার মধে মঠাশ্রিত জীবনে বাস অথচ সমষ্টিকে অস্বীকার করার প্রবণতা, লোকায়তের বাইরে সত্যানুষ্কানীদের সংহতিকে মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে অস্বীকার করে ব্যষ্টির সত্যসন্ধানী আত্মানুশীলন—এই বৈপরীত্যের ফল হয়েছিল এই বৌদ্ধ ধর্ম শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি।

পলিটি (polity) বা সমাজ ও রাষ্ট্রের মুখোমুখি বৌদ্ধ ধর্ম ছিল একান্তভাবে নির্বিকার। বৌদ্ধ সঙঘগুলি সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ে কোনদিনই চিন্তা করেনি।[৮৬] ধর্ম যখন রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে চারটি বিষয় সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। এই বিষয়গুলি হল বল (Force), ক্ষমতা (Power), স্বার্থ (Interest) এবং ঐতিহ্য ও তার পরিবর্তন (Tradition and Revolution)। এই চারটি বিষয়কে একত্রে গুচ্ছবদ্ধ করলে পাওয়া যায় প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞান। যে কোন কারণেই হোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম থেকেই এই রাজনৈতিক জ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত হতে পারেনি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে রাজনৈতিক জ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম অন্বিত না হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি পর্বে বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্টভাবে একটি সামাজিক তথা রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম যিনি প্রবর্তন করেছিলেন সেই সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়। তিনি ছিলেন রাজপুত্র। এই রাজপুত্র প্রবর্তিত ধর্মকে যারা পরে সমর্থন করে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়েছিলেন তারা প্রায় সবাই হলেন ক্ষত্রিয় রাজা। বৌদ্ধ ধর্ম যখন প্রবর্তিত হয়েছিল তার কিছুকাল আগে থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে ধীরে

৮৫. "Yet the transcendence which each person discovers in unique, and hence the idea of transcendence in Buddhism ıs quite variegated. Atleast in theory, this has meant that Buddhism is the least political religion yet encountered in terms of its own inherent vision." —ঐ

৮৬. "The orders of monks (Samghas) are not primarily concerned about a normative group polity. Monasteries have, of course, a certain discipline, but the true monk is beyond all that and in no way is concerned about political life, including the political life of the order. —ঐ

ধীরে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব দেখা দিচ্ছিল। প্রথমে ষোড়শ মহাজনপদের[৮৭] এবং পরে জনপদগুলির অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে একটি ব্যাপক অথচ শক্তিশালী অখণ্ড মগধ সাম্রাজ্যের[৮৮] উত্থান হয়েছিল। সাম্রাজ্য নির্মাণ ব্রাহ্মণদের কাজ নয়। তা ক্ষত্রিয়দের কাজ অর্থাৎ সার্বিকভাবে একটা ক্ষত্রিয় উত্থানের ঘটনা এই সময়ে ঘটছিল। সার্বিক ক্ষত্রিয় উত্থানের রাজনৈতিক আলেখ্যটি উপস্থাপিত করেছিল মগধ সাম্রাজ্য। এই উত্থানের ধর্মীয় আলেখ্যটি উপস্থাপিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে। ক্ষত্রিয় রাজনীতির সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্মতন্ত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রায় শিখরে উঠেছিল মহামতি অশোকের সময়ে। যদি একথা সত্য হয় যে এই অতিমহানুভব সম্রাট পুত্র-কন্যাকে[৮৯] বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য দেশান্তরে পাঠিয়েছিলেন তাহলে বলতে হবে এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।[৯০] রাজকুমারের পক্ষে ধর্মপ্রবর্তক হওয়া যদি এই ভারতবর্ষে সম্ভব হয় তবে এখানে এও সম্ভব যে রাজকুমার ও রাজকুমারী ধর্মপ্রচারক বা মিশনারি হয়েছিলেন। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন এই দুটি যে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথিত আছে যে ফ্রাঙ্কদের দুর্দমনীয় সম্রাট শার্লম্যান খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পথকে প্রশস্ত করার জন্য বহুবার স্যাকসনি (Saxony) আক্রমণ করেছিলেন।[৯১] স্বয়ং আকবরও নাকি একটি নতুন

---

৮৭. এই ষোড়শ মহাজনপদগুলি কাবুল উপত্যকা থেকে গোদাবরী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এই জনপদগুলির তালিকা এইভাবে দেওয়া আছে ঃ অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশি (বেনারশ), কোশ (অযোধ্যা), ব্রিজি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরখপুর জেলা), চেদি (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল), কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী, মীরাট), পাঞ্চাল (বেরিলি), মৎস্য (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী), অবন্তী (মালব, গান্ধার), পেশোয়ার, রাওলপিন্ডি), কম্বোজ (কাশ্মীর)।

৮৮. ষোলটি মহাজনপদ থেকে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল চারটি। বৎস, অবন্তী, কোশল ও মগধ। এদের মধ্যে মগধই একটি বড় মাপের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

৮৯. অশোকের পুত্রকন্যার নাম সম্ভবত মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। অবশ্য তাঁদের সিংহল যাত্রার সংবাদটি সত্য বলা কঠিন। How much or how little truth the tradition contains cannot at present be determined with certainty.' Professor Oldenburg, J. Murray Mitchell, *The Great Religions of India, p. 196 note.*

৯০. "The son and daughter of the Emperor (Ashoka), it is said, went as missionaries to Ceylon, and there as missionaries they lived and died. If this is true, I ask—is there in all history a more touching spectacle? It has a great lesson for Christians; may we lay that lesson to heart ! (ঐ)

৯১. শার্লম্যান-এর Saxony সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "But he persevered to the end in leading expedition after expedition against the rebels, punished their revolts by fire and sword...erected bishoprics, and sent forth countless

ধর্ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেননি। সিদ্ধার্থ তা করেছিলেন বলে 'তথাগত' হতে পেরেছিলেন, গৌতম হতে পেরেছিলেন 'বুদ্ধ'। ইতিহাস একথাও বলে যে পরবর্তীকালের একজন সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগের মেলায় সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতেন এবং অবশেষে বুদ্ধমূর্তির চরণতলে লুটিয়ে পড়তেন। ঘটনা হয়তো এতখানি ঘটত না। সামান্য ঘটনার মধ্যে হয়তো অতিরঞ্জন রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ে সামান্য ঘটনাও অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে। মোটের উপর মূল কথাটি হল একটি ক্ষত্রিয় গরিমার কথা যে গরিমার একটি চাকা হল রাজনীতি ও আরেকটি চাকা হল ধর্ম—একটি চাকা হল বল ও শক্তির (force and power) এবং অন্য চাকাটি হল আলোকিত বোধ ও সামাজিক সংস্কৃতির চাকা (Enlightenment and Social Culture)। এক বিরাট ক্ষত্রিয় অভ্যুত্থানের অগ্রগামী বিন্দুতে ছিলেন বিম্বিসার-অশোক-হর্ষবর্ধন। এই নৃপতিকুল যদি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঘেরাটোপের জোগান দিতে না পারতেন তবে সিদ্ধার্থের প্রতিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধত কিনা বলা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখেছেন,

'হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা।
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।।'

কবি প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় গরিমা ও ব্রাহ্মণ মহিমার পাশাপাশি অবস্থান কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের আবির্ভাবের পর এই সহাবস্থান সম্ভব হয়নি। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য এর ফলে নাড়া খেয়েছিল। পাশ্চাত্যের গবেষকরা বলেন যে এর ফলে বুদ্ধ স্বয়ং যে শ্রেণী ও যে বর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন সেই ক্ষত্রিয় বর্ণের ও যোদ্ধ্ শ্রেণীর মানুষদের উত্থান সহজ হয়েছিল।[৯২] বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ঠিক বিপরীত—

missionaries, till in the last ten years of his life he had the satisfaction of seeing Saxony both submissive and Christian".
The Dark Ages, p. 350.

৯২. "However, these aspects of Buddhism had enormous indirect influence, for they destroyed in principle—and in actuality for a period of time in India—the authority of the Brahmanic castes. Functionally, that left the *Ksatriya* class, the class of Buddha himself, a relatively free hand. Buddhism has, consequently, everywhere been spread and supported by kingly rulers—from the days of Asoka through the Chinese warlords in the north to Korean and Japanese courts, and through the nobility of Sri Lanka, Burma, and Indo-China in south to the king of Thailand today."
The Encyclopaedia of Religion, Vol. 11, p. 421.

প্রচারের মধ্য দিয়ে এর প্রবর্তন শুরু হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের ধর্মপ্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন।[৯৩] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারপর থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা বড় মাপের ধর্মপ্রচারের কাজ গৃহীত হয়নি। ভারতবর্ষে সে কাজ সাধন করেছিলেন ক্ষত্রিয় রাজারা, চীন-জাপান-কোরিয়াতে বৌদ্ধধর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যুদ্ধবাজ সামন্তপ্রভুরা; শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনে সামন্তপ্রভু ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। থাইল্যান্ডে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপ্তিলাভ করেছিল ক্ষমতাশীল রাজবংশের সহায়তায়। বৌদ্ধদর্শন জাগতিক বল, শক্তি ও ক্ষমতার সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটেছিল ক্ষমতার জাদুবলে, বল ও শক্তির পৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে।

বৌদ্ধধর্মের বৈপরীত্য ও শক্তি এইখানেই নিহিত আছে। দর্শনগতভাবে বৌদ্ধধর্ম অনাসক্তির মধ্য দিয়ে নিরাকার মুক্তির সন্ধানী। কিন্তু জাগতিক ব্যাপ্তি ও প্রচারের ক্ষেত্রে এই ধর্ম বরাবরই বলের দ্বারা ধৃত, ক্ষমতার সঙ্গে অন্বিত, রাষ্ট্রীয় শক্তিকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ কাঠামোকে ভেঙে ফেলার দুর্বার বেগবান শক্তি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ছিল কিন্তু অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচক্রের আশ্রিত না হলে তার অন্তঃকরণের তেজ কঠিন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিকূলতাকে বিদীর্ণ করতে পারত কিনা বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকে বহুলাংশে ভাঙতে পেরেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের ঔদার্য বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করেছিল। হিন্দুধর্ম মূলত অন্তর্মুখী (introvert), তাই ধ্যানমগ্ন। ইসলামধর্ম মূলত বহির্মুখী (extrovert) তাই প্রচার সচেতন, সম্প্রসারণশীল। জন্মলগ্ন থেকে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মতই অন্তর্মুখী, কিন্তু তথাগত বুদ্ধ তাকে শুরু থেকে করেছিলেন প্রচার সচেতন, অতএব আপন বিস্তৃতির জন্য প্রয়াসশীল। পরবর্তীকালের ইসলাম ও সূচনাকালের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মিল এইখানেই। কিন্তু যতদিন গেছে বৌদ্ধধর্ম ততই লোকায়ত জীবন থেকে সরে এসে মঠাশ্রিত হয়েছে। ক্রমশ একটি চার্চের রূপ নিয়েছে, একক আত্মানুসন্ধানের গভীর নির্জনতায় মগ্ন হয়েছে। ফলে একটু একটু করে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রচারবিমুখতা এসেছে। এর ফল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ভালো হয়নি। হিন্দুধর্মের অন্তর্মুখী মগ্নতায় ধ্যান ও জ্ঞানের সমন্বয়ে যে অধিবিদ্যার ইন্দ্রজাল কালের বৈগুণ্যকে অস্বীকার করেও অটল, অভ্রভেদী হতে পেরেছিল বৌদ্ধধর্ম সেই অধিবিদ্যার ইন্দ্রজালকে কখনো বিস্তার করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকে নিজের মুষ্টির মধ্যে চেপে রেখে সমাজ বিপ্লবের দরজা খুলে দিয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু দর্শন ও অধিবিদ্যায় হিন্দুধর্মের মহিমাকে সে ম্লান করতে পারেনি।

একজন পাশ্চাত্য টীকাকার বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম কতখানি হিন্দুধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মন্তব্যটি এই রকম :

৯৩. *The Great Religions of India p. 182.*

আশ্চর্যের বিষয় আপন বিস্তারে বৌদ্ধধর্ম সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে বহন করে নিয়ে গেছে যেগুলি সম্বন্ধে সে তর্ক তুলেছিল। প্রায় না জেনেই বর্ণকাঠামোর তত্ত্বগত বিভিন্ন ধারণাকে সে বহন করেছে (যে ধারণা হল সবচেয়ে সোপানবিভক্ত হিন্দু রাজনৈতিক তত্ত্ব) এবং বহন করেছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বোধ যেমন শিল্প, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, সংখ্যাতত্ত্ব, কাব্য ইত্যাদি। তাকে নিয়ে গেছে সারা এশিয়ায়, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে জনতার স্তরে এসে আদি ধর্মচেতনাকে প্রভাবিত করেছে বা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে যেমন সে প্রভাবিত হয়েছিল চীনে কনফুসিয় ও মাও মতবাদের দ্বারা। যে সব সংস্কৃতির মুখোমুখী সে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রত্যেককেই সে দিয়েছে বিশ্বজনীন সদাচার। এর ফলে বৌদ্ধধর্মের মৌল নীতি হিন্দু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মতো হয়েছে বহুধাবিভক্ত। কিন্তু যেখানেই সে উপস্থিত হয়েছে সেখানেই সে রাজকীয় আধিপত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে এবং সর্বত্রই চিহ্নিত হয়েছে রাজমুকুটের সবচেয়ে দীপ্তিময়ী হীরা বলে। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা উৎসাদিত না হওয়া পর্যন্ত সে ছিল রাজকুলের প্রতিরক্ষায় লালিত। আধুনিক বৌদ্ধধর্ম জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আত্মচেতনার দ্বারা নিবিষ্টভাবে আশ্লিষ্ট।[৯৪] বৌদ্ধধর্ম শান্তির ধর্ম হলেও তার প্রচার ও বিস্তারের জন্য কেন্দ্রায়িত রাজনৈতিক-সামরিক শাসনের (centralised political-military rule) অবদান যে কত ব্যাপক তা ইতিহাস পাঠ করলেই জানা যায়।[৯৫]

বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে রাজনৈতিক-সামরিক শক্তির সঙ্গে অন্বিত হলেও এই ধর্ম কোনদিন প্রচার ও বলপ্রয়োগের দ্বারা জাগতিক পৃথিবীকে বদলাতে চায়নি যেমনটি চেয়েছিল ইহুদি (Judaism), খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম কোন ঈশ্বরের সাধনা করে না, তাই, ঈশ্বরের নামে রাষ্ট্র ও সমাজকে বদলাতে চায় না। কিন্তু এই তিনটি ধর্ম তা চায়। বৌদ্ধধর্ম নিজে থেকে কোনদিন রাজনীতির সঙ্গে করমর্দন করেনি, কিন্তু রাজনীতি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্মের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ইহুদী,

৯৪. "Ironically, in its expansion Buddhism carried precisely those ideas against which it argued. Thus almost inadvertently it has carried with it categories of ontocratic caste structures (the part of Hindu political theory that is most hierarchically ordered) and rich cultural forms—arts, music, astrology, numerology, poetry, and so forth—throughout Asia as far as Japan and Indonesia. In each content, it altered and was altered at the popular levels by the absorption of primal religious sensibilities—as well as by confusion and Taoist motifs in the north—as it gave a mere universalistic piety to the cultures it encountered'. *Encyclopaedia of Religion*, Vol. 11, p. 421.

৯৫. তদেব।

খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। এই তিন ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে সর্বজনীন, আয়ত্ত করার দিক থেকে অনেক বাস্তব, অথচ সর্বাঙ্গীণভাবে উচ্চতর কোন সত্যের সেবায় রাজনীতিকে নিযুক্ত করার চেষ্টায় তারা সতত সচেতনভাবে ব্রতী।[৯৬] এই কারণে এই তিন ধর্ম প্রয়োগের দিক থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাধান্যকামী (hegemonistic)। ফলে এই তিন ধর্মের নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে দেখা গেছে তা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায়নি। ভারতবর্ষে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিরোধ সে বিরোধ ইতিহাসগতভাবে অতি নগণ্য, কারণ সমস্ত সংঘাতের মধ্যে সহাবস্থানের ইতিহাসটাও কম নয়। যেখানে ইউরোপে চার্লস মারটেল-এর সময় থেকে খ্রিস্টধর্ম ইসলাম ধর্মকে রুখবার চেষ্টা করেছে এবং সেই প্রচেষ্টাকে শেষ পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের রণ-রক্ত-সফলতা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেখানে ভারতবর্ষে ইসলাম কোনদিনই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেনি, কিংবা হিন্দুধর্ম কোন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইসলামকে সম্মুখ সমরে ডাকেনি। দুই ধর্মের আপোষ এইখানেই। হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের আপোষের একটা বড় কারণ বোধহয় এই যে এই ধর্ম কোনদিন একটা রাষ্ট্রীয় মতবাদরূপে গড়ে ওঠার চেষ্টা করেনি। অনেক পরে ঔপনিবেশিক যুগে প্রতীচ্য শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যখন হিন্দুধর্ম থেকে হিন্দুবাদ স্বতন্ত্র একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় চৈতন্যকে গ্রাস করতে চাইল তখনই ভারতীয় ইসলামের অন্তঃকরণে শঙ্কার কালো ছায়া উঁকি দিতে লাগল। এর ফল হল এই যে ইসলামও এক সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লীন হল। ইসলাম ভুলে গেল যে ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হওয়ার আগে যে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী মুঘল সাম্রাজ্য ইসলামের হেফাজতে গড়ে উঠেছিল তা ছিল আসলে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট অংশীদারি বা পার্টনারশিপ যার মধ্যে আঠারো শতকে খ্রিস্টান শক্তি এসেও ভাগ বসিয়েছিল। তখনও এদেশে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ হিন্দুনামে বিরুদ্ধ ধর্মী সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল এক মানবশক্তির আড়ালে

৯৬. Judaism, Christianity and Islam are religions that want to bring politics to the service of higher truth—more universal in principle and in practical reach. All of these religions, in their impact upon politics, are peppered with distortion, scandal, and terror; they are also salted by moments in their histories when they were able to call upon their deepest presuppositions to provide rich resources of wisdom and rational calculation of interests for the common good. But the force that drives these religions, and that will be of incalculable import for political life so long as they continue to exist, is that they will constantly try to transform the world in the name of God". *Ibid, p. 418.*

ঘনায়মান ধর্মীয় তমিস্রার মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে বিলীন হওয়ার ভয় তখন ভারতের এই ইসলামধর্মী বলিষ্ঠ মানবসমাজকে গ্রাস করেনি। তখন ইসলাম উদার হতে পেরেছিল কারণ হিন্দুধর্মও উদার ছিল। শঙ্করাচার্য থেকে চৈতন্যদেব পর্যন্ত দীর্ঘসময়ে হিন্দুধর্ম কখনোই হিন্দুবাদকে জন্ম দেয়নি। ফলে ইসলামের অন্তকরণে আশঙ্কার কালোছায়া কখনো উঁকি মারেনি। এমনকি আঠারো শতকে মারাঠারা যখন হিন্দুপাদশাহী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল তখনও ভারতীয় ইসলাম নাড়া খায়নি এবং তখনও বিপন্ন মুঘল সম্রাট মারাঠার সাহায্য নিয়ে মসনদে আসীন থাকার চেষ্টার মধ্যে কোন লজ্জা খুঁজে পাননি। এর কারণ হিন্দুরা শক্তিমান হলেও দুর্বিনীত হয়নি। আপন শক্তিতে দুর্বল মুসলমান শাসককে ক্ষমতায় কায়েম রেখেও তাকে কুর্নিশ জানিয়েছে, তার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তার অধস্তন হয়েছে, তাকে অপসারণ করে গদীয়ান হতে চায়নি। এই ঐতিহ্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। তখনও হিন্দুরা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। ক্ষমতাসীন মুঘলশাসককে সেলাম জানিয়ে তাঁর ঝাণ্ডা তুলে ধরেছে আসমানে। সেদিন পর্যন্ত দুই ধর্মের মধ্যে মানবিক আদানপ্রদানের ব্যাঘাত কোথাও ঘটেনি।

এর পরে ছবি গেল উল্টে। হিন্দুরা ভুলল মুসলমানের সহিষ্ণুতা। মুসলমানরা ভুলল হিন্দুদের ঔদার্য। কেন? আপন অন্তঃপুরে এই দুই ধর্ম কি এমন কোন শক্তিকে টিকিয়ে রেখেছিল যা পরস্পর বিবদমান? একবার খ্রিস্টান জগতের দিকে তাকানো যাক। দেখি ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত সেখানে কি রূপ নিয়েছিল। পৃথিবীর বিরাট অঞ্চলের খ্রিস্টানরা দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিসাবে বাস করত। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাদের সহমর্মিতা না থাকলেও তারা কোনদিন ইসলামের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে মারমুখী হতে পারেনি। হয় ইসলামের শক্তি সম্বন্ধে তাদের ভয় ছিল, কিংবা ধারণা হয়েছিল ইসলাম খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে না, এক সময়ে তা হটে যাবে। কিন্তু যেদিন বুঝল যে ইসলাম সহজে হটে যাওয়ার নয় সেদিন থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এমন কথা পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ববিদ সমাজতাত্ত্বিকরাই বলে থাকেন।[৯৭] খ্রিস্টধর্ম ক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামও রুষ্ট হল এবং উভয়ে উভয়ের দিকে সমালোচনার কাদা ছুঁড়তে লাগল। এই কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ইসলাম ছিল অনেক সংযত। পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে ইসলামের পোলেমিকস্ (polemics) ঘাঁটলে দেখা যাবে যে ইসলাম হয়তো খ্রিস্টজগৎ সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব পোষণ করত কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ইসলাম ও

৯৭. "Christians long remained a majority under Muslim rule, but they began to attack Islam as soon as they realized that it had come to stay."
Encyclopaedia of Religion, Vol. 11, p. 402

তার নবী সম্বন্ধে যে জ্বালাময় বিষোদগার করেছে তা ইসলামের মধ্যে কখনো আত্মপ্রকাশ করেনি।[৯৮] এইরকম পারস্পরিক সমালোচনার মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটি বিরোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা ভারতবর্ষের কোনদিন ঘটেনি। হয়তো এর জন্য হিন্দুধর্মের সহনশীলতা বা ঔদার্য দায়ী। কিংবা হয়তো হিন্দুধর্ম ছিল বরাবরই বহুধাবিভক্ত এবং ঐক্যের অভাবে নিস্তেজ। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে পোলেমিক রচনা করার শক্তি হিন্দুধর্মের কখনোই ছিল না। অন্যদিকে ইসলাম দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় শাসন শক্তির সঙ্গে অন্বিত ছিল বলেই হোক বা হিন্দু দর্শনের ব্যাপ্তির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই হোক রাজনৈতিক পোলেমিকে যায়নি। বিদেশের মাটিতে নিজের শিকড়কে প্রোথিত করার আগে সংঘাতে যাওয়া যে অকর্তব্য ইসলাম তা জানত। তাই রাজ্য ও ঐশ্বর্যের লিপ্সায় সে মন্দির ভেঙেছে কিন্তু মন্দির ভাঙাকে কোনদিন জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হতে দেয়নি। বিধর্মীকে স্বধর্মে আনার যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক যুগে ছিল তা পেরেছিল রাষ্ট্রীয় শক্তির সচেতন পৃষ্ঠপোষকতা, কিন্তু প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে এইরকম পৃষ্ঠপোষকতা সচেতনভাবে ঘটেছে ইতস্তত, এখানে সেখানে, অল্প কয়েকবার—বারবার নয়। আঠারো শতকে বাংলাদেশে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ খাজনা দিতে না পারার জন্য জমিদারকে চরম শাস্তি দিয়েছেন তার জাত মেরে দিয়ে ধর্ম কেড়ে নিয়ে, কিংবা উনিশ শতকে হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের সর্বস্ব গ্রাস করেছে নির্মম শাসনের চাবুক চালিয়ে। কিন্তু কোন ঘটনাই ধর্মের নামে ঘটেনি, ঘটেছে রাষ্ট্রশক্তির অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। রাজ্য শাসন করতে হলে রসদ দরকার, আর শাসনের রসদ শোষণ করেই আসে। এই নীতির ঘোড়দৌড়ই ইতিহাসের সবচেয়ে স্থায়ী ঘটনা—যুগপৎভাবে তা পুরাঘটিত ও ঘটমান।

আসলে ভারতবর্ষের যে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত কখনো বড় আকারে দেখা দেয়নি তার দুটো কারণ আছে। এক, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সমন্বয়ধর্মী, ঐক্যপ্রয়াসী। এখানে বহু ভাষা, বহু বর্ণ, বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি কালের বৈগুণ্যকে অস্বীকার করেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রেখেছে। বহুর সমাহার যেখানে স্পষ্ট, বৈচিত্র্যের বৈভব যেখানে স্বীকৃত, সেখানে কেউই একচ্ছত্র নয়, সার্বভৌমত্বের দাবি সেখানে থাকে না, একের বাহাদুরি সেখানে টেকে না। সেখানে সাধনা সমন্বয়ের, তপস্যা ঐক্যের। এই কারণে সম্ভবত হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম কেউই অন্যকে দলিত করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি বা পারেনি। এরই ফলে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষে কোনদিন বড় মাপের রাজনীতিভিত্তিক ধর্মীয় লড়াই হয়নি।

৯৮. "Muslim Polemic was often contemptuous, but it was never as virulent as Christian abuse of Islam and the Prophet". *Ibid.*

আরেকটি কথা। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে কোন ধর্ম বা ধর্মাশ্রিত মানুষ বলেনি যে অন্য ধর্ম বা ধর্মাশ্রিত মানুষ নিকৃষ্ট এবং তার বা তাদের কাজ হচ্ছে অসভ্য মানুষকে সুসভ্য করে তোলা। ভারতবর্ষে সুসভ্যতার আলো জ্বালানোর দায়িত্ব নিয়েছিল খ্রিস্টান ধর্ম, ঔপনিবেশিক যুগে। 'ব্রাউনম্যানস্ বারডেন' কথাটার মধ্যে প্রতীচ্য দেশীয় মানুষরা আত্মশ্লাঘা খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একটা অহঙ্কারও ছিল যে অহঙ্কার শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যদেশীয় মানুষদের মধ্যে একটা জাতিবৈরিতা ও ধর্মবৈরিতার হলাহল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগুলির একটি হল হিন্দুধর্ম। তারই ঘরে, তারই দেবালয়ে প্রবেশ করে যখন খ্রিস্টধর্মের দূত সুসভ্যতার বাতি জ্বালাতে গেল তখন হিন্দুধর্মের সংরক্ষিত অন্তঃকরণে বহুযুগের অনড় প্রশান্তির মগ্নমৈনাক নড়ে উঠল। হিন্দুধর্ম তার সনাতন শক্তিকে জাগিয়ে তুলল—দেখা দিল হিন্দুত্ব—ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম পোলেমিকের খোলসে আত্মরক্ষার বর্মটি খুঁজে পেল। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার যে দেশে শ্বেতসাহেবরা এসেছিল নাকি সুসভ্যতার বাতি জ্বালাতে। এই আস্ফালনের বিরুদ্ধে উনিশ শতকে হিন্দুরা যে লড়াই করেছিল তা ছিল সংস্কৃতির লড়াই। এর জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক লড়াইটা দিয়েছিল মুসলমানরা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে।

ধর্মের সঙ্গে ধর্মের যে লড়াই তা অনেক সময়ে ধর্মের আঙ্গিনা ছেড়ে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইতে পরিণত হয়। এইরকম লড়াইয়ের উৎসে অনেক সময়ে সংগোপনে একটি ঘটনা কাজ করে তা হল প্রচার (preaching)। যে কোন ধর্মের টিকে থাকা ও আত্মবিস্তারের জন্য প্রচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। বৌদ্ধ ধর্ম যতদিন প্রচার-সচেতন ছিল ততদিন তার ভেতরের বিস্তারধর্মী সজীবতা টিকে ছিল। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম শুরু থেকে সমানভাবে প্রচারধর্মী থাকায় আজও তাদের ভেতরের প্রাণশক্তি অফুরাণ থেকে গেছে। হিন্দুধর্ম সূচনার সময় থেকে যত অগ্রসর হয়েছে তত প্রচার থেকে আচারের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। বর্ণব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদকে চিহ্নিত করা হয়েছে, আচারের আধিক্যের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদকে চিহ্নিত করা হয়েছে, আচারের আধিক্যের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্পর্শকে এড়িয়ে লোকায়ত জীবনকে ক্রমশ আড়ষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিজের অন্তঃকরণের বোধ ও শক্তিকে হিন্দুধর্ম ক্রমশ খুইয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে দৃঢ় করেছে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদ তুলে দিয়ে। তাদের প্রার্থনা ব্যবস্থায় যে কংগ্রিগেশন (congregation) বা মাস ওয়রশিপ-এর (mass worship) ছবিটি দেখা যায় তা হিন্দুধর্মের মধ্যে দেখা যায় না ফলে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের পেছনে সঙ্ঘশক্তি বেড়েছে, ধর্মভিত্তিক সমাজ ঐক্যের মধ্য দিয়ে যূথবদ্ধ মানুষের লোকায়ত বল রাষ্ট্রশক্তির পেছনে বড় রকমের মদত হিসাবে কাজ করেছে।

ধর্মীয় পরিকাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সমাজ একটি ক্ষমতার উৎস হিসাবে রাষ্ট্রশক্তিকে নিরঙ্কুশ মদত দিয়েছে—এমনটি হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে কখনো হয়নি। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তি হিন্দুধর্মের মাথায় ছত্রধারণ করেছে এমন ঘটনা অনেক আছে। ধর্মও রাষ্ট্রশক্তিকে পথনির্দেশ করেছে এরকম ঘটনারও অভাব নেই। কিন্তু ধর্ম সমাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রশক্তিব পেছনে একটি নিঃসীম ক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করেছে এমনটি হিন্দু ভারতের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায়নি। ধর্ম এরকমভাবে প্রচারে যেতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তিও এককভাবে ধর্মকে প্রচার করার দায়িত্ব বেশিদিন পালন করতে পারে না। প্রচারের জন্য ধর্ম ও রাজশক্তির অন্বয় দরকার—এই অন্বয় খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘটেছে, তাই তাদের সাফল্য এত চমৎকার। এর উল্টোদিকে ধর্ম এককভাবে প্রচারশীল হয়ে ব্যর্থ হয়েছে—তার উদাহরণ হিন্দুধর্ম, রাষ্ট্রধর্মের বোঝাকে বহন করে এককভাবে এগোতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেছে—তার উদাহরণ বৌদ্ধধর্ম। ধর্ম সমাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সমাজশক্তি রাষ্ট্রশক্তিকে—হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে না, যেমনটি পাওয়া যাবে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে।

প্রচারের বিষয়ে খ্রিস্টধর্ম ইসলাম থেকে অনেক সূক্ষ্ম কারণ সে শিক্ষাকে প্রচারের বাহন করেছে। ভারতবর্ষে ইসলাম আসার ফলে হিন্দুধর্ম কখনো নাড়া খায়নি, কারণ ইসলাম শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারকে মেলাতে পারেনি। এই মিলিয়ে দেওয়াটা খ্রিস্টধর্মের কাজ, তাই খ্রিস্টধর্মের প্রচার ব্যবস্থার মধ্যে যে সফিস্টিকেশন ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ইসলামের ধর্মপ্রচার অনেকটাই স্থূল—তা আশ্রয় করেছে বাহুবলকে, কিন্তু খ্রিস্টধর্ম? সেখানে অসির ঝনঝনা, শিক্ষার মন্ত্রণা ও ধর্মের সান্ত্বনা একাকার হয়ে গেছে। ইসলাম বঞ্চিত মানুষকে সাম্যের কথা শুনিয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টধর্ম সাম্যের সঙ্গে শান্তির বাণীকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল বলে তার আবেদন এত জোরালো। শান্তি আর সাম্যকে সংযুক্ত করলে যে অস্ত্র গড়ে ওঠে তা অত্যন্ত ধারালো এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম হিন্দুধর্মের কাছে এত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। যে চ্যালেঞ্জ এই দুই ধর্ম হিন্দুধর্মের সামনে হাজির করেছিল তা ইসলাম দেখাতে পারেনি। তাই ইতিহাসে হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে নাড়া খেয়েছে দুবার; একবার, বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের সময়ে—সেটা অতি প্রাচীনকালে, ইসলামের জন্মের আগে, আরেকবার ঔপনিবেশিক যুগে—উনিশ শতকে ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম আত্মপ্রকাশের সময়ে। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যে বিরোধ সে বিরোধ ইসলামের সঙ্গে কখনোই ছিল না। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যে বিরোধ, তার নিষ্পত্তি ঘটাতে সমাহিত রাজশক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল—বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে অশোক আর ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে আকবর। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। তাই উনিশ ও বিশ শতকে খ্রিস্টধর্মের

মুখোমুখি হিন্দুধর্ম থেকে জন্ম নিয়েছিল হিন্দুত্ব যা প্রাচীনকালে কখনোই ঘটেনি। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে ইসলাম জেগে উঠেছে বারবার—ওহাবি, ফরাইজি, মোপলা যে নামেই হোক না কেন। তা জেগেছে মূলত খ্রিস্টান শাসকশক্তির বিরুদ্ধে, কিংবা শাসকের মদতপুষ্ট শোষকশক্তির বিরুদ্ধে। সেখানে ইসলামের জেহাদ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না।

শিক্ষাকে বাহন করার ফলে খ্রিস্টধর্মের প্রচারধর্মিতা হয়েছিল অভিনব। যীশুখ্রিস্টের নাম ও শিক্ষা হিন্দু ভারতীয় জীবনের প্রায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল। এর জন্য ভাষা অনেকটা দায়ী। আরবি ভাষায় লিখিত কোরান কখনোই অমুসলিম মানুষের কাছে বড় মাপের সমাদর পায়নি। আরবি ভাষাও কোনদিন সরকারি ভাষা ছিল না। অন্যদিকে মুদ্রণযন্ত্ররূপ প্রচারযন্ত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ঔপনিবেশিক শাসকরা এবং তাদের সঙ্গে শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রচারকরা বাইবেলকে ইংরাজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে তার জনপ্রিয়তাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর ইংরাজি ভাষা হল সরকারি ভাষা—শিক্ষার মাধ্যম। অতএব খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার অলিন্দে অনায়াসে প্রবেশ করল যে প্রবেশ ইসলাম কখনো ঘটাতে পারেনি।

খ্রিস্টধর্মের আরেকটা দিক আছে যেদিকে হিন্দুধর্ম বা ইসলাম তার সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারেনি। সেটা হল একটা দুঃখকাতর মর্ত্যমানবের প্রতি আবেদনের দিক। অশিক্ষার দ্বারা অন্ধজনকে শিক্ষার আলো, রোগের দ্বারা ক্লিষ্ট মানুষকে সেবা—খ্রিস্টধর্মের মতো আর কোন ধর্ম এত নিষ্ঠা ও আতিশয্য নিয়ে দান করেছে? দয়া আর দান, সেবা আর শিক্ষা সব ধর্মের অনস্বীকার্য অংশ। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের মতো তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এমন ব্যাপকভাবে আর কেউ দেয়নি। অতএব হীনপতিতের ভগবানকে এইভাবে তুলে ধরার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তাকে মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম বা ইসলামধর্ম কারোরই ছিল না। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল সহিষ্ণুতার শিক্ষা, তৃণের থেকেও দীন ও তরুর থেকেও সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা। বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে মানুষ শিখেছে প্রেম ও সংযমের শিক্ষা—চরমকে এড়িয়ে মধ্যপন্থায় থেকে মৈত্রীর সঙ্গে আশ্লিষ্ট হওয়ার শিক্ষা। ইসলাম মানুষকে দিয়েছে সাম্যের দীক্ষা। জৈনধর্ম দিয়েছে অহিংসার বাণী। শিখধর্ম দিয়েছে সমাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা। আর খ্রিস্টধর্ম শিখিয়েছে চ্যারিটি বা করুণার বাণী—কাতরক্লিষ্ট, আতুর মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদানের বাণী। খ্রিস্টধর্ম এত মর্মস্পর্শী বলেই ভারতীয় সংরক্ষিত জীবনের দুর্গকে ভেঙে দিয়ে তার নিগূঢ় অন্তকরণকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম ও ঔপনিবেশিকতা গাঁটছড়া বেঁধেছিল বলেই ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিস্টধর্ম এত প্রবল একটি চ্যালেঞ্জের রূপ নিতে পেরেছিল। কথাটা ভুল না হলেও পূর্ণশতাংশ ঠিক নয়। মধ্যযুগে

ইসলামের হাত ধরে উপনিবেশবাদ যখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাত্রা করেছিল তখন কি ইসলাম খ্রিস্টীয় সমাজশক্তির অন্তঃকরণকে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল? রাষ্ট্রশক্তির মদতপুষ্ট হলে ধর্মের প্রসার ঘটে একথা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রের কাছ থেকে অভয় নিয়ে ধর্ম বাঁচে না। ধর্মের মধ্যে থাকে তার নিজস্ব স্ফুরণ, তার স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করে মানবহৃদয়। ধর্মের মধ্যে এই জ্বালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে রাষ্ট্র ধর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাহবা কুড়াতে চায়। অতএব ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের তত্ত্ব দিয়ে এশিয়ার মাটিতে খ্রিস্টধর্মের বেড়ে ওঠার তথ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। উনিশ শতকে বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম যেভাবে শিক্ষিত তরুণশক্তিকে গ্রাস করেছিল তা যতখানি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের ফল ঠিক ততখানিই খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত মানবিক উজ্জীবনের ফল। এর আগে বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে ইসলাম ধরে রেখেছিল রাষ্ট্রশক্তিকে। কিন্তু কোথায় ভিন্নধর্মী মানবসমাজের শিক্ষিত তরুণরা এমন করে ইসলামের নামে দিওয়ানা হয়ে উঠেছিল যেমনটি হয়েছিল খ্রিস্টের নামে হিন্দু তরুণরা? হিন্দু সমাজের জীর্ণতা তাদের ঠেলে দিয়েছিল, না; খ্রিস্টীয় মানবিকতা তাদের কাছে অনেক বড় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু মূল কথা হল যে ভারতের মাটিতে খ্রিস্টধর্মের অনায়াস সাফল্যকে তর্কের খাতিরেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রশক্তির প্রাবল্যজনিত বিস্তার বা তার অনায়াস সাফল্য, কারণটা যাইহোক না কেন, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম হিন্দুধর্মের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জকে যিনি প্রথম রুখেছিলেন তিনি হলেন রামমোহন রায়। তিনি ইসলামের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, ইসলামের মহত্তর ও উন্নততর জীবনাদর্শগুলিকে হিন্দুধর্মের সুমঙ্গল-বোধের সঙ্গে অন্বিত করিয়েছিলেন। তাঁর পৌত্তলিকতা বিরোধিতার মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য বিচারশীল মনের প্রতিফলন ঘটেছে যা একান্তভাবে ইসলামের দান। তাঁর সতীদাহ বিরোধিতা থেকে ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের যে চেষ্টা তার মধ্যে আছে সমাজের কদাচার থেকে শুদ্ধ মানবসত্তার পবিত্রতাকে উদ্ধার করে তার পুনর্বাসনের প্রয়াস। এইখানে তাঁর সুমঙ্গলবোধ কাজ করেছে। এইদিক থেকে বিচার করলে রামমোহন যতখানি হিন্দু ঠিক ততখানি মুসলমান। ঈশ্বর নিরঙ্কুশভাবে এক—ইসলাম এই ধারণায় তাঁকে আস্থশীল না করলে তিনি তাঁর হিন্দু চৈতন্যকে ব্রহ্মসাধনায় মগ্ন করতে পারতেন না—তিনি হতে পারতেন না ব্রাহ্ম।

খ্রিস্টধর্মসঞ্জাত চ্যালেঞ্জকে রুখে দেওয়ার ব্যাপারে রামমোহন হলেন হিন্দুধর্মের প্রথম স্তম্ভ। এর সর্বশেষ স্তম্ভটি হলেন বিবেকানন্দ। রামমোহন ভেঙেছিলেন, বা ভাঙতে চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাকে। বিবেকানন্দ ভাঙবার চেষ্টা করলেন হিন্দুধর্মের জাতিভেদ, বর্ণভেদের বৈষম্য, কুসংস্কার এবং আচারের নামে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কুলায় বেড়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানকে বিঘ্ন

ঘটাচ্ছিল। রামমোহন হাত মিলিয়েছিলেন ইসলামের সঙ্গে। বিবেকানন্দ করমর্দন করলেন খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে। তিনি খ্রিস্টধর্মের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন জীবসেবার বোধ যা খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এত গভীর, এত ব্যাপক, এত স্থায়ী। দ্বিতীয় যে ধারণা তিনি খ্রিস্টধর্মের দান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা হল চার্চ সংগঠনের ধারণা—অর্থাৎ ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিকে মঠাশ্রিত করার ধারণা। হিন্দুধর্মে যা ছিল তা নরনারায়ণের সেবা। এ সেবার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের জীবসেবার যে খুব পার্থক্য আছে তা নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মে আর্ত মানুষের সেবা কোনদিন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি যা পেয়েছিল খ্রিস্টধর্মে। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে বিবেকানন্দ জীবসেবার ধারণাটিকে নতুন করে হিন্দুধর্মের মধ্যে সংস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টীয় চিন্তার আলোকে।

মোটের উপর কথাটি হল এই যে হিন্দুধর্ম নিজের বহু শতাব্দীর অস্তিত্বের মধ্যে যে বোধটিকে লালন করে এসেছে তা হল সহাবস্থানের বোধ। আপন গৃহাঙ্গনে সে প্রতিবাদী ধর্মকে স্থান দিয়েছে। বহিরাগত ধর্মের সঙ্গে নিজের দেওয়া-নেওয়া গড়ে তুলেছে। অন্যের উদ্ধত চ্যালেঞ্জকে নিজের সহিষ্ণুতা দিয়ে বশীভূত করেছে। অন্যের অস্থিরতার পাশে নিরুত্তাপ থাকার এই ক্ষমতা হিন্দুধর্মকে দিয়েছে হিন্দুদর্শন। হিন্দুরা দর্শন ও সমাজতত্ত্ব দুটোকেই গড়েছে এবং দুটোকে মিলিয়েও দিতে পেরেছে। তাদের আসল শক্তি এইখানে। ধর্ম-কর্ম-দণ্ড-প্রায়শ্চিত্তের বোধ হিন্দু সমাজতত্ত্বের সুনিশ্চিত বনিয়াদ। হিন্দু দর্শন পুরাঘটিত এবং ঘটমান এই দুটি সম্বন্ধেই মানুষকে প্রয়োজনে নির্বিকার ও উদাসীন হতে শিখিয়েছে। যার ফলে প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা যে কোন হিন্দুর জীবনে কমে গেছে। এইভাবে আত্মরক্ষার কবচ হিন্দুধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে দিয়েছে হিন্দু দর্শন। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে আত্মমগ্নতা। রাজনীতির রাহুগ্রাসে এই মগ্নতা বিকৃত হয়। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ধর্মীয় মগ্নতা এই বিকারের শিকার হয়েছে এ কথা প্রযোজ্য। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যতটা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও ততটাই।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষে কি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ?

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে দুটি বড় মাপের আর্থ-সামাজিক দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল। এক শ্রমের যথেষ্ট উৎপাদনমুখী (Productive) প্রয়োগ ছিল না এবং সেই কারণে শ্রম থেকে যথেষ্ট পুঁজির জন্ম হয়নি। দুই, সমাজ-সম্পদকে কোন ব্যাপক বিনিয়োগধর্মী প্রয়োগের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার দর্শন গড়ে না ওঠায় সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus) শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে কোন ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা সমাজবর্গের (social order) আত্মসাতের মধ্য দিয়ে। এর ফল হয়েছে বিপজ্জনক। রাষ্ট্র কখনোই রাজস্বের সর্বাধিকরণ (revenue maximization) ঘটাতে পারেনি। সে রাষ্ট্রই সবল যে রাষ্ট্র তার প্রজা বা নাগরিক বা তার ক্ষেত্রভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিষ্ঠানের সাচ্ছল্যকে নষ্ট না করে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রাজস্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ের এককের মধ্যে আহরণ করতে পারে। সে সরকারই সব থেকে সবল হওয়ায় সম্ভাবনা রাখতে পারে যে সরকার তার শাসনের রসদ (means of governance) প্রয়োজনমতো সবটুকু জোগাড় করতে পারে। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকরা আসার আগে একান্ত করে রাজস্ব সর্বাধিকরণের কোন প্রয়াস চালান হয়নি, এর জন্যে বড় মাপের কোন আর্থ-সামাজিক দর্শন গড়ে তোলা হয়নি এবং সবচেয়ে বড় কথা হিন্দু-ভারতের সমাজব্যবস্থায় যে বর্ণ-বিভাজন ছিল তা রাজস্ব সর্বাধিকরণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কি ছিল তা আলোচনা করলে উপরের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। শ্রম থেকে বিরত থাকলে যে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এই ভারতীয় সমাজনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল ব্রাহ্মণরা। মনু-সংহিতায় মনু দান বলতে বুঝিয়েছিলেন ব্রাহ্মণদেরকে দান।[১] শিক্ষক, পুরোহিত, জ্যোতিষী ও পরামর্শদাতা— এই চাররূপে ব্রাহ্মণরা রাজসভা থেকে দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত সর্বত্রই তাদের একটি ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে এসেছে— তা হল দান-গ্রহীতার ভূমিকা। রাজা ও প্রজা উভয় মিলেই ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধানকে সমাজ শাসনের বিধিবদ্ধ নীতি হিসাবে

দাঁড় করিয়েছিল। গ্রামদান, ভূদান, গোদান, কাঞ্চন ও রত্নদান, অর্থ ও শ্রমদান[২] এ সবের মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় আর্থনীতির বিষম দিক প্রতিফলিত হত। ব্রাহ্মণরা লাঙল ধরতেন না, কৃষিকাজে শ্রম দিতেন না, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরজীবী ও পরান্ন প্রতিপালিত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতেন। যুগভেদে ও স্থানবিশেষে এই নীতির সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এটাই ছিল সাধারণভাবে সমাজ-শরীরে শ্রেণীগত কিংবা পেশাগতভাবে ব্রাহ্মণদের অবস্থানের বিধিসম্মত ও স্বীকৃত নীতি। তদুপরি ব্রাহ্মণদের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন ছিল সীমিত ও সংযত। বর্তমানকালে যাকে আমরা ফৌজদারি আইন বলি তা ব্রাহ্মণদের উপর প্রযোজ্য ছিল না।[৩] বড় মাপের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার, সুবিধা পাওয়ার অর্থ ছিল এই যে, ব্রাহ্মণরা সমাজে একটা বিশেষ শাসনতান্ত্রিক সুবিধাভোগী বর্গ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বিজয় আস্ফালনের কাজে যখন আমরা নতজানু ও শুদ্ধ-কৃতাঞ্জলি হই তখন আমরা ভুলে যাই যে সমাজের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সুবিধাভোগী বর্ণ ও বর্গ হিসাবে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সবচেয়ে বড় ফল হয়েছিল এই যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। বিচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের শাসনতান্ত্রিক অব্যাহতি দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রের আইন বিষমভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। তার ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিদারুণভাবে মার খেয়েছিল। রাজা ব্রাহ্মণকে গ্রামদান, ভূদান ইত্যাদি নানারকম দান করার ফলে দেশের শাসক সহাস্যে ও অত্যন্ত আতিশয্যের সঙ্গে তার রাজস্বের উৎসকে হস্তান্তরিত করে দিতেন এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে এই প্রক্রিয়া বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে শাসকের যে সচ্ছলতা থাকলে তার সুস্থিতি অব্যাহত থাকত তা মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হত। প্রজারাও বিভিন্ন প্রকার দান, অর্থ ও পণ্যের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিত। তার ফলে প্রজার উদ্বৃত্তে টান পড়ত এবং প্রজার আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে নিশ্চিতভাবে কিছুটা ধীনতা নেমে আসত। ফলে কর বৃদ্ধি করে প্রজার কাছ থেকে আরও রাজস্ব আদায় করে রাজস্বের সর্বাধিকরণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব হত না। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে রাজারা যে ক্ষতিস্বীকার করতেন সেই ক্ষয়ের অনেকটাই তারা পূরণ করতে চাইতেন প্রজাদের শোষণ করে। কিন্তু কখনোই রাজস্বের সর্বাধিকরণের যে লক্ষ্য তারা স্থির করতেন তা পূর্ণ হত না। ব্রাহ্মণরা রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও বহুলাংশে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারতেন। এর ফলে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে ব্রাহ্মণরা অর্থ ও ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র্য ও সন্তুষ্টির একটা নিজস্ব ক্ষেত্র (enclave) গড়ে তুলতে পারতেন যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি চলত ব্রাহ্মণদের একটা সামাজিক সার্বভৌমত্ব। সমান্তরাল এই দুই

সার্বভৌমত্বের অবস্থান প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একসময়ে সম্রাটের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও পোপের ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব পাশাপাশি চলেছিল। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিবর্তনের অনিবার্য-নিয়মে যুগান্তরের সহাবস্থানশীল এই দুই সার্বভৌমত্ব একসময়ে পরস্পরবিরোধী, বিবদমান, দ্বন্দ্বসঙ্কুল দুটি বিপরীত শক্তিতে পরিণত হল। তারপর অনেকদিন ধরে চলল পরস্পরের দ্বৈরথ সমর। রাজনৈতিক রাষ্ট্র যখন ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষসাধন করে তাকে বিদায় করতে পারল তখনই দেশে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব হল। নব্য রাজতন্ত্র (new monarchy) ও রিফর্মেশন এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের যে সংহতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এসেছিল তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল অচিন্তনীয়। ইংল্যান্ডে টিউডর যুগে সপ্তমী হেনরী যেভাবে ব্যারণতন্ত্রকে বিধবস্ত করেছিলেন, তাদের রাজস্ব, স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক স্বাধিকারের দাবিকে যেভাবে পরাভূত করেছিলেন তা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। এদেশে সুলতানী শাসনের সময়ে উলেমাদের ক্ষমতা ও চক্রান্তকে নির্মূল করার প্রয়াস কখনো কখনো দেখা দিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রশাসন যখন শেষ পর্যন্ত শরিয়তী শাসনের বিকল্পরূপে গড়ে উঠতে পারেনি তখন ধর্ম থেকে ভিন্ন রাজনীতি-নির্ভর যে রাষ্ট্রব্যবস্থার দর্শন একসময়ে ম্যাকিয়াভেলি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা ভাবতের মাটিতে জন্ম নিতে পারল না। ভারতবর্ষের দুই মহামতি শাসক অশোক ও আকবর দেশের মানুষকে দিয়েছিলেন সর্বমত সহিষ্ণুতার 'ধম্ম' বা পরমতকে সাঙ্গিকরণের (acculturization) ধর্ম যার নাম দীন-ই-ইলাহী। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রধর্মের নিযন্ত্রক। ভারতবর্ষে ধর্ম রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার ফলে পাশ্চাত্যে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রবোধ। এই রাষ্ট্রবোধের শতনাম আছে যার একটি হল রামরাজ্য।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থার গঠনতন্ত্রের যে ত্রুটি তা একটি বড় মাপের আপোষকামিতা থেকে জন্ম নিয়েছিল। রাষ্ট্রশাসক ও ধর্মশাসক উভয় ছিল উভয়ের সম্পূরক শক্তি। একের সঙ্গে অন্যের আপোষকামিতার লক্ষ্য ছিল এক—মর্যাদা (status building)।[৪] ব্রাহ্মণ যদি একাধারে ধর্মনায়ক ও অন্যধারে দেশশাসকের কুলপুরোহিত হিসাবে বলে দেন যে রাজার বংশ চন্দ্র বা সূর্য থেকে উদ্ভূত তাহলে শাসক-পরিবারের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আর দেশের শাসক অনুগৃহীত হয়ে ব্রাহ্মণের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভূমিদানের মধ্য দিয়ে রাজস্ব বিলিয়ে দেওয়ার কাজে সানন্দে মেতে ওঠেন। পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের এই কৌলিন্যপ্রাপ্তির আশা সার্বভৌম ধর্মীয় শাসক ও সার্বভৌম শাসকের মধ্যে প্রয়োজনকেন্দ্রিক, আদানপ্রদান-ভিত্তিক আপোষ-সম্পর্কের সুদৃঢ় শৃঙ্খল রচনা করেছিল। পরবর্তীকালে বণিকরাও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পারস্পরিক মর্যাদা-

বিপণনের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল।[৫] বণিকের অর্থ পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত না হয়ে অনুৎপাদনশীল কাজে—যেমন মন্দির নির্মাণে—ব্যয়িত হতে লাগল।[৬] মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্টীয় চার্চ এবং বণিক গিল্ড (merchant guilds) গুলি পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করেছে, ফলে ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি গাঁটছড়া বাঁধতে পারেনি। চার্চের বিরুদ্ধে লড়াই পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা—কখনো তা বণিকেরা করেছে, কখনো তা করেছে রাজারা। এর ফলে ধর্মের মুখোমুখী রাজনীতি ও ধর্মের মুখোমুখী অর্থনীতি দুটোই সজাগ থেকেছে এবং রাজনৈতিক রাষ্ট্র সাবলীল অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর দাঁড়াতে পেরেছে।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজা ও বণিকদের সম্পর্ক ছিল প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট (patron-client) সম্পর্ক। একজন পৃষ্ঠপোষকতা করত, অন্যজন অনুগৃহীত হত। কখনো ব্রাহ্মণ হতেন প্যাট্রন, রাজ্য বা বণিক ক্লায়েন্ট, কখনো বা এর ঠিক বিপরীত। এর ফল ছিল দুটি এবং দুটিই দুরপনেয়ভাবে গভীর। সমাজের মুখোমুখী ব্রাহ্মণ এবং রাজা দুজনেই ছিলেন প্রভু, কারণ দুজনেই ছিলেন সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus) ভোগের ব্যাপারে দাবিদার। ব্রাহ্মণরা যে-কোনো প্রকার দানই গ্রহণ করুন না কেন তা ছিল সামাজিক উদ্বৃত্তের অংশ। সামাজিক উদ্বৃত্তের শোষকরূপে ব্রাহ্মণরা ছিলেন শাসকের সহযোগী এবং দুই প্রভুর (double masters) দাবিকে পূরণ করতে গিয়ে সমাজের হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকত না যে উদ্বৃত্তকে রাষ্ট্রশাসক আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে করের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারতেন। এর ফলে রাজনৈতিক রাষ্ট্র সমস্ত প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে ছিল দুর্বল। রাষ্ট্র-বিপ্লবকে ঠেকানো ভারতীয় রাজাদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। রাষ্ট্রশাসক হিসাবে রাজা ও সমাজ-নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্রাহ্মণদের পরস্পরের সমঝোতা এই সামাজিক উদ্বৃত্ত শোষণের অংশীদারির মধ্যে নিহিত ছিল।[৭] এই অংশীদারি বিঘ্নিত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হত। এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে মৌর্যশাসন যে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েছিল তা কে অস্বীকার করতে পারে?

পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের আরেকটি বড় ফল ছিল, তা হল ধনিক ও ব্রাহ্মণদের সমঝোতা। বণিকরা যখন তাদের বাণিজ্যলব্ধ অর্থকে মন্দির নির্মাণ সেবার কাজে লাগাতে শুরু করল তখন উৎপাদনমুখী অর্থের বিনিয়োগধর্মিতা কমে গেল। ইউরোপে চার্চ যে সুযোগসুবিধা ভোগ করত তার দ্বারা যাজকদের পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বাজারে বিপণনের খরচ কমে যেত। বণিকদের এই সুযোগসুবিধা ছিল না বলে বিপণনের ক্ষেত্রে তারা যাজকদের কাজ থেকে বড় মাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হত। অনিবার্যভাবেই এর ফলে সারা দেশে একটা যাজক-বিরোধিতা (anti-celericalism) আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই যাজক-বিরোধিতা ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এদেশে পুরোহিত-বিরোধিতার নজির খুব বেশি নেই। মর্যাদা (status) লাভের দৌড়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন রাজারা বা বণিকরা। এর বিষময় ফল হল ব্রাহ্মণরা আত্ম-সন্তুষ্ট সামাজিক বর্গ থেকে শ্রমদানে বিমুখ, উদ্বৃত্তভোগী শোষকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হল। এর উপর যখন তাদের দেবত্বের মহিমা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল[৮] তখন শ্রমের সঙ্গে যুক্ত সমাজশ্রেণীগুলি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। সমাজের মূল মানব-উপাদান থেকে ব্রাহ্মণদের অর্থ, শ্রম ও অন্যান্য সুবিধাভোগের বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (alienation) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। সাংস্কৃতিকভাবে মূল মানব উপাদান থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে একই রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে দুটি সমাজ বিরাজ করতে লাগল—একটি ঊর্ধ্বতন, আরেকটি অধস্তন সমাজ, একটি ব্রাহ্মণদের সমাজ, আরেকটি অব্রাহ্মণদের সমাজ, একটি শাসকের সমাজ, আরেকটি শাসিতের সমাজ, একটি সামাজিক উদ্বৃত্তভোগী সমাজ, আরেকটি সামাজিক উদ্বৃত্তের জোগানদার সমাজ। শেষ পর্যন্ত একটি হল শোষকের সমাজ, আরেকটি হল শোষিতের সমাজ। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকরূপে শাসকরা সমাজনিয়ন্ত্রকরূপে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিজের মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন বলে ভারতবর্ষে কোনদিন রাজনৈতিক রাষ্ট্র সার্বভৌম হতে পারেনি। রাজনৈতিক রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝানো হবে যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, কিংবা ধর্ম সম্বন্ধে নির্বিকার। যেখানে রাষ্ট্র ধর্মকে কুক্ষিগত করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে, ধর্ম রাষ্ট্রকে গ্রাস করে না সেখানেই রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভব। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার ফলে সাধারণভাবেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যাহত হয়েছিল। এক শাসনের মধ্যে শাসন-নিরপেক্ষ হওয়ার ভাব, আইনের অধীনে থেকে আইন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ভাব, শাসকের ছত্রছায়ায় থেকে শাসকের রাজস্বে দাবিদার হওয়ার ঘটনা প্রতীচ্যের ইতিহাসে দুর্লভ। এদেশে সমাজের মধ্যে সমাজ ছিল, আইনের মধ্যে ছিল আইন-নিরপেক্ষতা। ফলে সহজাতভাবেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজ, আইন-নিরপেক্ষ রাজস্ব-স্বয়ম্ভর হয়ে নিজের মধ্যে সেই উপাদানগুলির পূর্ণ সঞ্চয় ঘটাতে সাহায্যে করেছে যার দ্বারা সেই সমাজ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি সার্বভৌম শক্তির প্রতিরূপকে সার্থক করতে পারে। এইভাবে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের জঠরে সদাসর্বদা লুকিয়ে থাকত তারই বিরোধীশক্তির ভ্রূণ। এই আভ্যন্তরিক দুর্বলতার জন্য ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হয়নি।

সূত্র নির্দেশ :

১. দীনেশ চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, 'সোস্যাল লাইফ ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বি. এন. শর্মা রচিত বর্ণ-ব্যবস্থা এ্যান্ড কাস্ট সিস্টেম ইন দ্য সেভেন্থ্ সেঞ্চুরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৭৮

২. দ্রষ্টব্য : (ক) অতীন্দ্রনাথ বোস, সোস্যাল এ্যান্ড রুরাল ইকনমি অব নর্দান ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬০-৬৩

(খ) বি. এন. এস. যাদব, সেকুলার ল্যান্ড গ্র্যান্টস অব দ্য পোস্ট গুপ্ত পিরিয়ড এ্যান্ড সাম এ্যাসপেক্টস অব দ্য গ্রোথ অব ফিউডাল কমপ্লেক্স ইন নর্দান ইন্ডিয়া—দীনেশ চন্দ্র সরকার, উপরে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৩

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হিস্টরি অব বেঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪

৩. এটি ছিল বড় মাপের শাসনতান্ত্রিক সুবিধাভোগ। পরবর্তীকালে ইউরোপে আমরা যে সুবিধা (privilege) ভোগের ছবি দেখি এবং যার বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লব একটি দুঃসাহসিক অভিযান ঘোষণা করেছিল তা সবই ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বা আর্থিক সুবিধাভোগ। কিন্তু শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যে সুবিধা, যা প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণরা ভোগ করত, তা পৃথিবীব ইতিহাসে দুর্লভ।

৪. দ্রষ্টব্য : (ক) ডি. এন. ঝা, টেম্পলস্ এ্যান্ড মার্চেন্টস্ ইন সাউথ ইন্ডিয়া, সি. এ. ৯০০—এ. ডি. ১৩০০—এসেস ইন অনার অব এস. সি. সরকার

(খ) অতীন্দ্রনাথ বোস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৭১-৭৫; মর্যাদা নিয়ে সমঝোতার একটি অন্য দিক হল এই যে শ্রেণীসংঘাত কখনো তীব্র হতে পারে না। প্রাচীন ভারতে শ্রেণীসংগ্রাম কেন পাশ্চাত্য সমাজের মতো তীব্র হল না তা নিয়ে অতীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা ও অতীন্দ্রনাথ বোসের লেখা এক অনুষঙ্গে পড়তে হবে।

৫. ডি. এন. ঝার উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য

৬. ঐ

৭. দ্রষ্টব্য : (ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা, উপরে উল্লিখিত; (খ) কোসাম্বি, মিথ এ্যান্ড রিয়ালিটি; (গ) আর. এইচ. টনি, রিলিজিয়ান এ্যান্ড দ্য রাইজ অব ক্যাপিট্যালিজম; (ঘ) আপ্পাডোরাই, ইকনমিক কন্ডিশনস্ ইন সাউথ ইন্ডিয়া (এ. ডি. ১০০০-১৫০০) দুই খণ্ড

৮. দ্রষ্টব্য : (ক) লুই রেণু (Louis Renou), দ্য সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া [মূল ফরাসি ভাষা থেকে ফিলিপ স্প্রাট কর্তৃক অনূদিত], দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, ৪২-৪৫।